সতীনাথের পাঠশালা

[অশ্রুসজল সামাজিক পালা]

সন্তানহারা মা, শ্মশানে চিতায় প্রিয়, অচেনা পায়ের বধূ, সতীর পুত্র

অভিশাপ, অভাগিনী বধূ প্রভৃতি প্রণেতা

—মরমী পালাকার—

শ্রীমহাদেব হালদার প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ

মুকুন্দপুর জাগরণী নাট্য সংস্থায় অভিনীত

ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

[মূল্য : পঁচিশ টাকা

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

ঘুম নেই [সামাজিক]
মা-মাটি-মানুষ ,,
পরশ পাথর ,,
ময়লা কাগজ ,,
জানোয়ার ,,
কান্না-ঘাম-রক্ত ,,
রক্তে রোয়া ধান ,,
পাঁচ পয়সার পৃথিবী ,,
পদধ্বনি ,,
মাটির কেল্লা [ঐতিহাসিক]
দেবী মালিনী ,,
ফেরারী বান্দা ,,
বেগম আশমান তারা ,,
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা ,,
বাঁদী লালবাঈ ,,
স্বর্গ হতে বিদায় [পৌরাণিক]
শাপমুক্তি ,,

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র

সীতার বনবাস [পৌরাণিক]
ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ,,
আকালের দেশ [সামাজিক]
সূর্য সেন (মাষ্টারদা) ,,

নির্মল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পিতাপুত্র [সামাজিক]
কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী ,,
মা হলো বন্দী ,,

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী প্রণীত

রাধার নিয়তি [সামাজিক]

প্রকাশক—এস, এস, ধর
ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

* * *

প্রচ্ছদ—সত্য চক্রবর্তী

* * *

গৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত

পরস্ত্রী [সামাজিক]
মানুষের ঠাকুর [পৌরাণিক]

শম্ভুনাথ বাগ প্রণীত

শুধু বিয়ে দুই [সামাজিক]
জ্বালা ,,
ঘুম ভাঙার গান ,,

শ্রীরঞ্জন দেবনাথ প্রণীত

জল্লাদের বিচার [সামাজিক]
বিষাক্ত পৃথিবী ,,
লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার ,,
বনপলাশীর পদাবলী ,,

সত্যপ্রকাশ দত্ত প্রণীত

নীরাব বঁধুয়া [ঐতিহাসিক]

কানাই নাথ প্রণীত

রক্তে রাঙা মাটি [ঐতিহাসিক]

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

কবরের নীচে [ঐতিহাসিক]
অভিশপ্ত হারেম ,,

অনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

রঘু ডাকাত [সামাজিক]

* * *

মুদ্রক—শ্রীঅশোক মেট্যা
এস কে মুদ্রন

খুনী সমাজ (১টি স্ত্রী)

[illegible] প্রতিজ্ঞা (স্ত্রী বর্জিত)

আহুতি (মেয়েদের)

সামাজিক জীব অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে অট্টহাসি হাসছে। হাহাকার করে কাঁদছে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষ। ওই হতভাগা বাপ নিজের দেহের রক্ত বিক্রি করে অসুস্থ ছেলের মুখে পথ্য তুলে দিচ্ছে, দাদাকে বাঁচাতে বোন যাচ্ছে চাকরি করতে, এক হতভাগিনী ভাবী স্বামীর আরোগ্য কামনায় মায়ের মন্দিরে করুণা ভিক্ষা করছে। তারপর···

মুকুন্দপুর জাগরণী সংঘের সুখ্যাত নট আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রীস্বপন মুখার্জী নাটকটি তার ক্লাবে অভিনয়ের জন্যে নিয়ে যায়। ওই সংস্থার সুখ্যাত নাট্য পরিচালক ও পশ্চিমবঙ্গ ব্লক যুব করণ বিভাগ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নির্দেশক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুনির্দেশনায় এবং জাগরণী সংঘের প্রতিটি শিল্পীর সুঅভিনয়ে নাটকটি যশের শিখরে পৌঁছে যায়। এর জন্যে উক্ত সংস্থার প্রতিটি শিল্পী কলাকুশলী, নাট্য নির্দেশক এবং হুগলী জেলার বলরামবাটী নিবাসী আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। ইতি

—শ্রীমহাদেব হালদার

উৎসর্গ

ব্যথার সমুদ্রে ডুবে অকালে ঝরে গেছে যেসব নারীর জীবন,

যারা পায়নি স্বামী-সংসার-সন্তান,

সেইসব নারীর স্মৃতির বেদীমূলে উৎসর্গীত

আমার এই সতীনাথের পাঠশালা।

পরিচয়

— পুরুষ —

সত্যনাথ	...	দরিদ্র ব্যক্তি।
শেখর	...	ঐ পুত্র।
পলাশ	...	ঐ বন্ধু।
বীরেন	...	ধনীর পুত্র।
বিশু	...	ঐ ভৃত্য।
আলোক	...	কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার।
নবীন	...	ঐ ভৃত্য।
তারিণী	...	অসৎ ব্যক্তি।
নির্মল	...	ঐ পুত্র।
ঝণ্টু ও নিশীথ	...	সমাজবিরোধীদ্বয়।
মিঃ দেশাই	...	মহৎ ব্যক্তি।
ভৈরব	...	পূজারী ব্রাহ্মণ।
দীপঙ্কর	...	পুলিশ অফিসার।
অভয়	...	ভিক্ষুক।

— স্ত্রী —

বিশাখা	...	বীরেনের মাতা।
লতা	...	বীরেনের ভগ্নি।
গীতা	...	সত্যনাথের কন্যা।

॥ নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ॥

[redacted]

সতীনাথের পাঠশালা

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

অগ্রে ডাক্তারী ব্যাগ হাতে আলোক ও পশ্চাতে
চিন্তান্বিত সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

আলোক। [অন্যমনস্কভাবে] এঁ্যা!

সতীনাথ। আমার শেখর ভাল হয়ে যাবে তো?

আলোক। হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাল হবে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম—

সতীনাথ। বলুন।

আলোক। আপনাদের বংশে আগে কারও টি-বি রোগ হয়েছিল?

সতীনাথ। না-না, আমাদের বংশের কারও এ রোগ ছিল না। একমাত্র আমার শেখরই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। জানি না আমার কোন্ পাপে শেখর আজ কালব্যাধিতে পড়ল!

আলোক। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার শেখর ভাল হয়ে যাবে।

সতীনাথ। ঠিক বলছেন ডাক্তারবাবু?

আলোক। আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন।

সতীনাথ। বিশ্বাস আমি আপনার ওপর সম্পূর্ণ রেখেছি ডাক্তারবাবু। তাই তো শেখরের চোখে জল দেখলেই আমি ছুটে যাই আপনার ডাক্তারখানায়। আপনিও দয়া করে গরীবের বাড়িতে আসেন। আপনি এলে তবু আমি সান্ত্বনা পাই যে, আমার শেখর আবার আগের মত সুস্থ হয়ে উঠবে। মাঝে মাঝে আমি খুব ভেঙে পড়ি ডাক্তারবাবু। মনে হয় আমার শেখরকে বোধহয় আমি আর বাঁচাতে পারব না। [কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল]

আলোক। সতীনাথবাবু!

সতীনাথ। আমার শেখর যদি বাঁচে, তবে সে আপনার দয়াতেই বাঁচবে। আমি হাতজোড় করে আপনাকে মিনতি করছি ডাক্তারবাবু, আমার শেখরকে আপনি ভাল করে দিন। শেখর আর গীতা ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। ওদের তুজনের মুখের দিকে চেয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি। আমার যত সাধ-স্বপ্ন-আশা সব ওদের ঘিরে। জানি না আমার আশার তরণী মাঝ দরিয়ায় ডুবে যায় কিনা।

আলোক। সতীনাথবাবু!

সতীনাথ। যদি সত্যিই ডুবে যায়, হতভাগ্য মাঝি শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু কামনা করবে। কেঁদে কেঁদে বলবে, হে ঈশ্বর! তুমি আমায় মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

আলোক। আপনি শান্ত হোন সতীনাথবাবু। এখনই এত নার্ভাস হলে চলবে না। ঘরে অসুস্থ রোগী, আপনার তুর্বলতার কথা জানতে পারলে সে নিজেও তুর্বল হয়ে পড়বে। এই সময় আপনার কর্তব্য— বুকে সাহস সঞ্চয় করে রোগীকে সাহস দেওয়া।

সতীনাথ। কিন্তু—

আলোক। না, কোন কিন্তু নয়। এটা ডাক্তারি নির্দেশ আর আপনি মানতে বাধ্য। আশাকরি আমার কথাটা বুঝতে আপনি চেষ্টা করবেন।

সতীনাথ। হ্যাঁ, আপনার নির্দেশ আমি নিশ্চয়ই মেনে চলব ডাক্তারবাবু। আমার বুকে যত ব্যথাই জমে থাক, চোখে যত জলই আসুক, আমার শেখরের কাছে আমি দুর্বলতা প্রকাশ করব না। আমার শেখরকে ভাল করে তুলতে হবে। তার জন্য আপনি আমাকে যা বলবেন, আমি তাই করব। প্রয়োজন হলে আমি আমার জীবন পর্যন্তও দেব।

আলোক। আপনার দুঃখ—আপনার ব্যথা আমি সবই বুঝি সতীনাথবাবু! তবু রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে কঠিন কথাটা আপনাকে বললাম বলে আমার অপরাধ নেবেন না।

সতীনাথ। না-না, এ আপনি কি বলছেন ডাক্তারবাবু! আপনার অপরাধ—

আলোক। [হাসিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! ডাক্তাররাও অনেক সময় অপরাধ করে সতীনাথবাবু। যাক সেকথা। যে ওষুধগুলো লিখে দিয়েছি, সেগুলো এনে ঠিক সময়মত খাওয়াবেন। আর একটা কথা—

সতীনাথ। বলুন।

আলোক। এ রোগে শুধু ওষুধেই কাজ হবে না, প্রচুর পরিমাণে ভাল পথ্যও চাই।

সতীনাথ। ভাল পথ্য—

আলোক। হ্যাঁ, ওষুধ এবং পথ্য কোনটাকেই অবহেলা করলে চলবে না। এ রোগকে নিরাময় করতে দুটোই সমান প্রয়োজন। আচ্ছা চলি, নমস্কার। [প্রস্থান।

সতীনাথ। পথ্য? কোথায় পাব পথ্য? সময়মত ওষুধই কিনতে পারছি না। তবে কি শেখর আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে? [সহসা চিৎকার করিয়া] না, আমার শেখরকে আমি ভাল করে তুলবই। কিন্তু কেমন করে ভাল করব? ডাক্তারবাবু যে বললেন ভাল পথ্য চাই।

তারিণীর প্রবেশ।

তারিণী। হ্যাঁ, তুমি ঠিক ধরেছ সতীনাথ. আমার মনের কথা তুমি ঠিক ধরেছ।

সতীনাথ। কি কথা?

তারিণী। এই যে, আমি টাকা চাই।

সতীনাথ। টাকা।

তারিণী। হ্যাঁ, কদিন ধরেই তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু তোমার দেখা আর পাই না। জানি না আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, তাই তোমার শ্রীমুখ দর্শন পেলাম।

সতীনাথ। আপনি—

তারিণী। আমি সামান্য মানুষ। তোমার মত দেবতার দর্শন পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অনেক তপস্যায় আজ আমি দেবতার দর্শন লাভ করেছি।

সতীনাথ। দেবতা!

তারিণী। হ্যাঁ। যে সত্যকথা বলে, সৎপথে চলে, লোকে তাকে দেবতাই বলে। আমার তো মনে হয়, এ পৃথিবীতে তোমার মত সত্যবাদী লোক আর একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই তোমাকে আমি দেবতা ভাবি সতীনাথ।

সতীনাথ। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তারিণী। জেগে ঘুমুলে তার কানের কাছে যত জোরেই বাজনা বাজানো হোক না কেন, ঘুম তার কিছুতেই ভাঙবে না।

সতীনাথ। তারিণীবাবু!

তারিণী। তা আজকাল কিছু চাকরি-টাকরি পেয়েছ নাকি সতীনাথ। বাড়িতে থাকো না, নিশ্চয়ই খুব মোটা মাইনের চাকরি?

সতীনাথ। আপনি আমার দারিদ্র্যকে উপহাস করছেন তারিণীবাবু?

তারিণী। হেঁ-হেঁ-হেঁ! ভেবেছিলাম তুমি খুব বোকা। এখন দেখছি—না, আমার সে ধারণা ভুল, সত্যিই তুমি খুব চালাক। তা চালাকের পো—এবার আমার টাকাটা মিটিয়ে দাও।

সতীনাথ। হ্যাঁ, দেব।

তারিণী। দাও। [সতীনাথের সামনে হাত পাতিল]

সতীনাথ। আজ—

তারিণী। হ্যাঁ, আজই—এখুনি আমার টাকা চাই।

সতীনাথ। [অনুনয়ের সুরে] আপনি আমাকে আর কিছুদিন সময় দিন তারিণীবাবু, আপনার টাকা আমি নিশ্চয়ই শোধ করে দেব। ছেলেটার ভীষণ অসুখ। অনেক টাকার দরকার।

তারিণী। একথাটা তো অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি সতীনাথ। শুনে শুনে কান আমার পচে গেছে। এবার নতুন কিছু আবিষ্কার করো।

সতীনাথ। আমি—

তারিণী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! ভদ্রঘরের সন্তান বলে আমি তোমাকে টাকাটা দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি এমনই অকর্মণ্য যে, পাঁচ বছর ধরেও টাকাটা শোধ করতে পারলে না।

সতীনাথ। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি শোধ করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু অভাব এসে আমার গলা টিপে ধরে আমার সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

তারিণী। হুম্! কথার বাঁধুনী তো বেশ ভালই জানো। কিন্তু এই মিষ্টি কথায় আমি আর ভুলছি না।

সতীনাথ। আপনি—

তারিণী। টাকা নেবার সময় জোর গলায় বলেছিলে—আমি সত্যের পূজারী, আপনার টাকা যথাসময়ে শোধ করে দেব। তা হে সত্যের পূজারী! এখনও কি তোমার সে সময় আসেনি?

সতীনাথ। বলুন—যত পারেন আপনি আমাকে কটু কথা বলুন, আমি নীরবে সব সহ্য করব। আমি যে গরীব, আমাকে সব অপমান সহ্য করতেই হবে, সংসারে সমাজে এটাই তো গরীবের একমাত্র পাওনা তারিণীবাবু!

তারিণী। শোন সতীনাথ! আমি তোমাকে শেষবারের মত পনেরো দিন সময় দিচ্ছি। এই পনেরো দিনের মধ্যে যদি সুদ সমেত সমস্ত টাকা দিতে পার ভাল, নইলে তোমাকে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

সতীনাথ। তারিণীবাবু!

তারিণী। হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা। আশা করি তারিণী চক্রবর্তীর কথাটা মনে রাখবে।

[প্রস্থান।

সতীনাথ। টাকা—টাকা—টাকা। শুধু এই টাকার জন্যই আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। না-না, এখনই পাগল হলে চলবে না, এখনও যে আমার অনেক কাজ বাকি।

চাদর গায়ে অসুস্থ শেখরের প্রবেশ। উস্কোখুস্কো চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

শেখর। হ্যাঁ, এখনও অনেক কাজ বাকি। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, কোথা থেকে শুরু হবে—আর কিভাবেই বা শেষ হবে।

সতীনাথ। শেখর। তুই আবার অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এলি কেন বাবা?

শেখর। বিছানায় যে আমি আর শুয়ে থাকতে পারছি না বাবা। কত চেষ্টা করি শান্তিতে একটু ঘুমোবার, কিন্তু ঘুম আমার চোখে কিছুতেই আসে না। চোখের সামনে সব সময় শুধু ভেসে বেড়ায়—

সতীনাথ। কি?

শেখর। একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে থাকি, কিন্তু সে দৃশ্যটাকে কিছুতেই আমার চোখের সামনে থেকে দূরে সরাতে পারি না।

সতীনাথ। কি সে দৃশ্য?

শেখর। সেকথা জানতে চেয়ো না বাবা, তুমি সহ্য করতে পারবে না।

সতীনাথ। না, তুই আমাকে বল্ শেখর। আমি সব সহ্য করতে পারব।

শেখর। দুদিন পরে যা দেখতে পাবে, আজ তা শুনে লাভ কি?

সতীনাথ। এসব তুই কি বলছিস শেখর?

শেখর। বলছি, আমাকে আর ওষুধ খাইয়ো না বাবা। অনেক দিন ধরেই তো ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু ভাল হবার কোন লক্ষণ নেই। কি হবে অযথা আমার পেছনে পয়সা খরচ করে! যে নৌকো ঝড়ের

মুখে পড়ে স্রোতে ভেসে চলেছে, তাকে আর শত চেষ্টা করেও কিনারায় ভেড়াতে পারবে না।

সতীনাথ। বলিস না রে, অমন করে তুই বলিস না। ওরে, আমি যে তোর মুখের দিকে চেয়েই বেঁচে আছি। তোকে হারালে আমি আর বাঁচব না।

শেখর। বাঁচতে তোমাকে হবে বাবা। আমি অক্ষম, গীতার ভবিষ্যত যে তোমাকেই গড়ে দিতে হবে।

গীতার প্রবেশ।

গীতা। আমার ভবিষ্যত নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না দাদা।

শেখর। গীতা!

গীতা। আগে বলো, আমার বারণ করা সত্বেও কেন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছো?

সতীনাথ। হ্যাঁ, তুই একটু বকে দে তো মা। জানিস গীতা, তোর দাদা আমার কথা একদম শুনতে চায় না। ভাবে, বুড়ো মানুষ, তার কথার কোন দাম থাকতে নেই।

গীতা। না দাদা, বিছানা ছেড়ে উঠে এসে তুমি কিন্তু ভাল কাজ করনি।

শেখর। সব সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে যে আমার ভাল লাগে না রে বোন।

গীতা। তাই বলে ডাক্তারের নির্দেশ মানবে না, তা তো হবে না। তোমাকে শুয়ে থাকতেই হবে। আমি জোর করে তোমাকে শুইয়ে রাখব।

শেখর। তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, তাই না রে গীতা?

গীতা। তুমিও তো আমাকে কম ভালবাস না দাদা। বাবা, এই পঁচিশটা টাকা রাখ। [টাকা দিল] মাসের শেষে তবু পঁচিশটা টাকা তোমার হাতে তুলে দিতাম, সামনের মাস থেকে তাও বন্ধ হয়ে গেল।

সতীনাথ। কেন রে? টিউশনি কি—

গীতা। মেয়েটা মামার বাড়ি চলে যাচ্ছে, সেখান থেকেই পড়াশোনা করবে।

সতীনাথ। বিশাল সমুদ্রে একটুকরো কাঠ ভেসেছিল, সেটাও তলিয়ে গেল অথৈ জলে! যাক—সব যাক, আমি কিছুতেই টলব না। আমি স্থির নেত্রে তাকিয়ে থাকব অফুরন্ত জলরাশির দিকে। দেখব—ওই জলরাশি আমাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌছায়—কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌছায়।

[অশ্রুভরা কণ্ঠে প্রস্থান]

গীতা। বাবা একেবারে ভেঙে পড়েছে।

শেখর। ভাঙবে না! কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়ে বিরাট মহীরুহ ভেঙে পড়ে, আর এ তো সামান্য মানুষ। জানিস গীতা, তোর আর বাবার কথা চিন্তা করলে আমি স্থির থাকতে পারি না। আমার মাথায় আগুন জলে যায়।

গীতা। দাদা!

শেখর। বাবার বয়স হয়েছে, সংসারের হাল ধরব আমি। তুই বড় হয়েছিস, ভাল পাত্র দেখে তোর ভাল ঘরে বিয়ে দেব। কিন্তু তা না করে এই সংসারে আমি একটা জড় পদার্থের মত অবস্থান করছি। আমার এই হাতদুটো কিছু করতে চায়—চায় বাবার মুখে

হাসি ফুটিয়ে তুলতে, চায় তোর সুখের নীড় বেঁধে দিতে। কিন্তু পারব না রে বোন, পারব না। আমি যে অক্ষম, আমি যে—[হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

গীতা। চুপ করো দাদা, তুমি চুপ করো।

শেখর। চুপ করে থাকতে আমি পারি না রে বোন। সব দাদারা তার বোনের সুখের নীড় বেঁধে দেয়। আর আমি খাঁচায় বন্দী পাখির মত নীল আকাশের দিকে চেয়ে একবুক যন্ত্রণা নিয়ে খাঁচার মধ্যেই ছটফট করে মরছি। [প্রস্থানোদ্যত]

গীতা। দাদা—

শেখর। না—না, আমাকে দাদা বলিসনি রে বোন, দাদা বলিসনি। দাদা হবার যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলেছি—হারিয়ে ফেলেছি।

[অশ্রুভরা কণ্ঠে প্রস্থান

গীতা। দাদা সব সময় নিজেকে অপরাধী ভাবে। আর ভাববে নাই বা কেন? সংসারের যা অবস্থা, তাতে কিভাবে যে চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। আমিও বুঝতে পারছি না গীতা।

গীতা। কি বুঝতে পারছ না পলাশদা?

পলাশ। তোমার মনের কথা।

গীতা। আমার মনের কথা?

পলাশ। হ্যাঁ। তোমার ভালবাসার গভীরতা কতখানি, আজও আমি টের পেলাম না।

গীতা। [আহত কণ্ঠে] তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো পলাশদা?

পলাশ। না, মানে—

গীতা। তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসি। আমার ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ নেই।

পলাশ। আমি তা জানি।

গীতা। তাহলে বললে কেন, আমার মনের কথা তুমি বুঝতে পারনি! আচ্ছা পলাশদা, আমার মনে আঘাত না দিলে, আমার চোখে জল না দেখলে তুমি বুঝি শান্তি পাও না? [কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

পলাশ। গীতা! [কাছে যাইয়া গীতার মাথায় হাত রাখিল। গীতা সজল চোখে পলাশের বুকে মুখ লুকাইল] এই, শোন—কথা শোন গীতা। আমি কথাটা এমনি বলেছি, তোমাকে ঠিক আঘাত দিতে চাইনি।

গীতা। না গো না, অমন করে তুমি বলো না। আমি সব সহ্য করতে পারি, আমার ভালবাসার অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। আমার অনুরোধ, আমার ভালবাসাকে তুমি কোনদিন ছোট করে দেখো না।

পলাশ। বিশ্বাস করো, তুমি আঘাত পাবে জানলে আমি একথা বলতাম না। আমার ভুল হয়েছে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

গীতা। [পলাশের মুখে হাত চাপা দিয়া] চুপ করো, ওকথা বলতে নেই। আমি নারী, তুমি পুরুষ। নারীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তুমি নিজেকে ছোট করো না।

পলাশ। গীতা—তুমি কি?

গীতা। [দুই হাতে পলাশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া] তোমার ভাবী স্ত্রী গো মশাই—ভাবী স্ত্রী। [গীতাকে কাছে টানিয়া লইল পলাশ] এই, ছাড়ো! বাবা বাড়িতে আছে। [দূরে সরিয়া গেল]

পলাশ। এই হয়েছে এক জ্বালা! অভিভাবকদের ভয়ে—না, এবার পাকা লাইসেন্স না করলে আর চলবে না।

গীতা। পাকা লাইসেন্স তো তোমার হাতেই মশাই, ভয় কি?

পলাশ। আমি তো এখুনি রাজী, তুমি শুধু বলছো এখন নয়—পরে।

গীতা। লক্ষীটি! আর কিছুদিন তুমি অপেক্ষা করো, দাদা সুস্থ হয়ে উঠলেই—

পলাশ। হ্যাঁ, ভালবেসেছি যখন প্রতীক্ষা তো করতেই হবে। দেখি প্রতীক্ষার অবসান কবে হয়।

গীতা। রাগ করলে?

পলাশ। না, প্রতিদিন চোখের সামনে তোমাকে একবার করে দেখতে পাচ্ছি—এটাও তো কম আনন্দ নয়!

গীতা। ভেতরে চলো, বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

পলাশ। হ্যাঁ, চলো। আচ্ছা, দাদার শরীর এখন কেমন?

গীতা। সেই একই রকম। এসো—

পলাশ। চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীরেনের বাড়ি

উত্তেজিত বীরেন ও পশ্চাতে বিশাখার প্রবেশ।

বীরেন। না-না, এ হবে না—হতে পারে না।

বিশাখা। কেন হবে না?

বীরেন। সে তুমি বুঝবে না।

বিশাখা। আমি বুঝব না?

বীরেন। না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মতিভ্রম হয়েছে। তাই তুমি একথা বলতে পারলে।

বিশাখা। কি বলছিস বীরু! আমি তোর মা।

বীরেন। মা বলে তোমার অন্যায় আব্দারকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না।

বিশাখা। অন্যায় আব্দার?

বীরেন। নয় তো কি! সতীনাথ ঘোষালের সঙ্গে আমাদের চির-দিনের শত্রুতা। বাবা কোনদিন ওদের বাড়িতে জলস্পর্শও করেনি। আর তুমি কিনা চাও তোমার মেয়েকে ওই বাড়িতে বিয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে?

বিশাখা। লতার ইচ্ছে—

বীরেন। লতার ইচ্ছেটাই বড় কথা নয়, আমাদের একটা ষ্ট্যাটাস আছে। আমাদের পাশে দাঁড়াবার মত কোন যোগ্যতাই সতীনাথ ঘোষালের নেই।

বিশাখা। এখন হয়তো নেই, কিন্তু একদিন ছিল।

বীরেন। কবে ছিল না-ছিল আমি তা জানতে বা শুনতে চাই না। আমি তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি মা! লতার বিয়ে ওখানে হবে না।

বিশাখা। বীরু!

বীরেন। হ্যাঁ। সতীনাথ ঘোষালের ছেলে শেখরকে আমি কোনদিনই ভগ্নিপতি বলে স্বীকার করব না।

বিশাখা। কেন, শেখর ভগ্নিপতি হলে বুঝি তোর মান যাবে?

বীরেন। তার মানে! তুমি কি বলতে চাইছো?

বিশাখা। বলতে চাই অনেক কিছুই। তোর বাবা সতীনাথ ঘোষালকে—না, থাক—সেসব কথা আজ তোকে শুনিয়ে কোন লাভ হবে না।

বীরেন। শুনতেও আমি চাই না। আমি চাই—

বিশাখা। নিজের সুখের জন্য অপরের চোখে জল ঝরলেও তোর কিছু যায় আসে না, তাই না বীরু?

বীরেন। তোমার এ হেঁয়ালীর অর্থ?

বিশাখা। সব অর্থ যদি আমার জানা থাকত তাহলে এ সংসারে পাপ কোনদিন প্রবেশ করতে পারত না।

বীরেন। হুঁ। এখন বুঝতে পারছি, বাবা তোমাকে কেন সহ্য করতে পারত না।

বিশাখা। সেটা আমার অদৃষ্ট। তা হ্যাঁ রে বীরু, তোর বাবার মত তুইও কি আমাকে সহ্য করতে পারিস না?

বীরেন। জানি না। তোমাকে আমি একটা কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তোমার পথ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও, তাতে তোমার ভাল হবে।

বিশাখা। আমার ভালমন্দ আমাকেই ভাবতে দে বীরু, এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বীরেন। [বিরক্ত ভাবে] বেশ, মাথা ঘামাব না। তবে এটা জেনে রাখো, সতীনাথ ঘোষালের ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ে লতার বিয়ে হবে না। আর একথাটা তোমার আদরের মেয়েকেও জানিয়ে দিও।

[প্রস্থান।

বিশাখা। আশ্চর্য! সেই একই জেদ। বাপের স্বভাব পুরোপুরি পেয়েছে। ভেবেছিলাম বীরুকে আমার মত করে গড়ে তুলব, কিন্তু পারলাম না, এবারেও আমি হেরে গেলাম—হেরে গেলাম! [কাঁদিতে লাগিল]

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। না—না, এত সহজে হেরে গেলে চলবে না। [সহসা বিশাখার মুখের ওপর দৃষ্টি পড়িতেই] একি, আপনার চোখে জল! আপনি কাঁদছেন গিন্নিমা?

বিশাখা। [মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিয়া] এঁ্যা! কই, না তো। ও কিছু নয়।

বিশু। না-না, আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না গিন্নিমা। ওই তো—ওই তো আপনার চোখে এখনও জল চিক্‌চিক্ করছে।

বিশাখা। না রে না, জল নয়। চোখে একটা পোকা পড়েছে, তাই—

বিশু। ওকথা আপনার মুখ থেকে অনেকবারই শুনে আসছি।

আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো গিন্নিমা, খোকাবাবু আপনাকে কিছু বলেছে কিনা !

বিশাখা। বিশু !

বিশু। খোকাবাবুকে আপনি মানুষের মত মানুষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে মানুষ হয়নি। এ বংশের দূষিত রক্ত তাকে বিপথে চালিত করেছে।

বিশাখা। চুপ কর্ বিশু, ওরে তুই চুপ কর্। আর বলিস না, আমি সহ্য করতে পারছি না ! [কাঁদিয়া ফেলিল]

বিশু। গিন্নিমা !

বিশাখা। তোর কর্তাবাবুর সব অত্যাচার আমি মুখ বুজে সহ্য করেছিলাম বীরুর মুখের দিকে চেয়ে. শেষে বীরুও বড় হয়ে সেই পথ ধরলে। বলতে পারিস—বলতে পারিস বিশু, এখন আমি কোথায় সান্ত্বনা পাব ?

বিশু। চুপ করুন গিন্নিমা, চুপ করুন, চোখের জল ফেলবেন না। আপনার চোখে জল পড়লে আমার বুকে ব্যথা লাগে।

বিশাখা। বিশু !

বিশু। দীর্ঘদিন ধরে আমি এবাড়িতে চাকরের কাজ করছি। আমি দেখেছি কর্তাবাবু আপনার ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছেন, আপনার দুঃখে মুখ লুকিয়ে আমি কত কেঁদেছি।

বিশাখা। তুই এবাড়ির চাকর হলেও, তোর মধ্যে যেটুকু মনুষ্যত্ব আছে, আমার গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই। আগে যদি বুঝতে পারতাম, বীরু বড় হয়ে ওর বাবার পথ অনুসরণ করবে, তাহলে ছোটবেলাতেই আমি ওকে গলা টিপে শেষ করে দিতাম।

বিশু। গিন্নিমা !

বিশাখা। নিজের ছেলেকে খুন করায় লোকে আমাকে বলতো রাক্ষসী। আমি তা হাসিমুখে সহ্য করতাম, তবু অমানুষ ছেলের মা সাজতাম না।

বিশু। গিন্নিমা !

বিশাখা। অসৎ ছেলের মা হওয়ার চেয়ে নিঃসন্তান হওয়া অনেক ভালো রে বিশু, অনেক ভালো।

[প্রস্থান।

বিশু। সত্যিই তাই। ছেলের সুনামে মায়ের বুক যেমন গর্বে ভরে ওঠে, তেমনি ছেলের দুর্নামে মায়ের বুক ব্যথায় ভেঙে খান্ খান্ হয়ে পড়ে।

লতার প্রবেশ।

লতা। কি হয়েছে বিশুকা, এখানে দাঁড়িয়ে আপন মনে কি বক বক্ করছো? কবিতা লিখবে নাকি?

বিশু। কবিতা! সে আবার কি জিনিস? কই, কোনদিন তো নাম শুনিনি।

লতা। সে কি, তুমি কবিতার নাম শোননি?

বিশু। না।

লতা। তবে শোন।

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তার
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয়।

বিশু। বাঃ, খুব সুন্দর তো! একেই বুঝি কবিতা বলে মামণি?

লতা। হ্যাঁ। আচ্ছা বিশুকা, বলো তো, এই কবিতাটা কার লেখা?

বিশু। এই দেখ! আমি মুখ্যু মানুষ, কেমন করে জানব কার লেখা।

লতা। জান বিশুকা! এই কবিতাটা না—একজন মস্তবড় কবির লেখা।

বিশু। কি নাম কবির?

লতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশু। কি বললে?

লতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশু। ও, তোমাদের ওই কবি নিশ্চয়ই রবিবারে জন্মেছিলেন মামণি, তাই কবির মা নাম রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ।

লতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিশু: হাসছো যে!

লতা। তুমি এক-এক সময় এমন কথা বলো, যা শুনলে সত্যিই হাসি পায়।

বিশু। হাসো মামণি, হাসো। আমি যেন সারাজীবন তোমার মুখের ওই হাসি দেখে যেতে পারি।

লতা। বিশুকা!

বিশু। ছোট থেকে খোকাবাবুকে আর তোমাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। তাই আজ যদি তুমি কোন আঘাত পাও, সে আঘাত শুধু তোমার বুকেই লাগবে না মামণি—আমার বুকেও লাগবে।

লতা। বিশুকা!

বিশু। এই পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর মামণি। এখানে মানুষ মানুষের হাসি কেড়ে নিতে জানে—দিতে জানে না।

লতা। তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই না বিশুকা?

বিশু। আমি মুখ্যু মানুষ, আমার মধ্যে কতটুকু ভালবাসা আছে জানি না। তবে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় ঠাকুরের কাছে আমি প্রার্থনা করি—ওগো দয়াল ঠাকুর, আমার মামণিকে তুমি সুখে রেখো—সুখী করো—সুখী করো।

[প্রস্থান।

লতা। জানি না, বিশুকার এই অফুরন্ত ভালবাসার মূল্য আমি কেমন করে শোধ করব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্ধকার পথ

মদের বোতল হাতে টলিতে টলিতে নিশীথ ও ঝণ্টুর প্রবেশ।

নিশীথ। [মদ খাইতে গিয়া বোতল দেখিয়া] যাঃ শালা, সব শেষ! কর্পূর হয়ে উবে গেল নাকি?

ঝণ্টু। কি উবে গেল রে নিশীথ?

নিশীথ। অমৃত।

ঝণ্টু। কি বললি! অমৃত? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নিশীথ। নে, এটা ধর্, তোর বোতলটা দে। নইলে মেজাজ আমার আসছে না। [শূন্য বোতলটি দিয়া ঝণ্টুর বোতলটি লইল এবং মদ খাইল] আঃ—কি শান্তি!

ঝণ্টু। আজ কিন্তু তোর খুব বেশি খাওয়া হয়ে যাচ্ছে নিশীথ!

নিশীথ। আরে ব্রাদার, এ অমৃত যত বেশি খাব, ততই পরমায়ু বৃদ্ধি পাবে। জানিস না, অমৃত নিয়ে দেবতা-দানবে একদিন কি সাংঘাতিক যুদ্ধই না বেধেছিল? আচ্ছা, যুদ্ধে কারা জয়ী হয়েছিল বল্ তো?

ঝণ্টু। দেবতারা। দানবদের ফাঁক দিয়ে শুধু দেবতারাই অমৃত ভক্ষণ করেছিল। অথচ দানবদের সাহায্য না পেলে দেবতাদের সাধ্য হতো না সমুদ্র মন্থন করে অমৃত সংগ্রহ করা। আশ্চর্য! একজন পরিশ্রম করে মরল, আর অপরজন সেই পরিশ্রমের ফলভোগ করল।

নিশীথ। সেই ধারা আজও বয়ে চলেছে ঝণ্টু। একদল আর

একদলকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। এই তোর আমার কথাই ভেবে দেখ্ না। চাকরির জন্য দুজনে মায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে চার হাজার টাকা ঘুষ দিলাম, সেই কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা ভদ্রলোক আমাদের টাকাটা আত্মসাৎ করে নিলে, চাকরি করে দিলে না। আজ যদি আমরা চাকরি পেতাম তাহলে নিশ্চয়ই এই অসৎপথে নেমে আসতাম না।

ঝণ্টু। মনটা আমার মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয় রে নিশীথ। আমরা কি চেয়েছিলাম—আর কি পেলাম।

নিশীথ। যা পাইনি তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই রে ঝণ্টু। যা পেয়েছি, এই স্রোতেই নিজেদের গা ভাসিয়ে দিতে হবে। তারপর দেখব, এই দুরন্ত স্রোত আমাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌঁছায়!

ঝণ্টু। হাঁ, শুরু যখন করেছি, এর শেষ তো একদিন হবেই।

নিশীথ। অনেকক্ষণ থেকে বকবক করছি, দাঁড়া—একটু খেয়ে নিই। [মদ খাইতে লাগিল]

ঝণ্টু। সবটা শেষ করে দিসনি, আমার জন্য একটু রাখ্।

নিশীথ। নে, ধর্।

ঝণ্টু। [বোতল লইয়া মদ খাইল] সত্যি, আমাদের কত সুন্দর জীবন।

নিশীথ। হাঁ, শুধু ফুর্তি আর ফুর্তি! হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই শোন্—

ঝণ্টু। কি?

নিশীথ। কাছে আয় না—

[ঝণ্টু কাছে গেল, নিশীথ তাহার কানের কাছে মুখ দিয়া চুপিচুপি কি বলিল ও উভয়ে হাসিয়া উঠিল]

ঝণ্টু। সত্যি, তোর চয়েস আছে নিশীথ।

নিশীথ। আরে, আমি কোন্ বাড়ির ছেলে দেখতে হবে তো!

ঝণ্টু। মেয়েটা রাজী হবে তো?

নিশীথ। রাজী না হলে আমি জোর করে রাজী করাব।

ঝণ্টু। দেখ্ চেষ্টা করে, হলেই ভালই হবে।

নিশীথ। বলছিস ভাল হবে? [সহসা পায়ের শব্দ পাইয়া ঝণ্টু রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল] এই, কি দেখছিস অমন করে ওদিকে?

ঝণ্টু। কে যেন অন্ধকারে এইদিকেই এগিয়ে আসছে।

নিশীথ। তাই তো! এই সময়ে তো এদিকে কেউ আসে না।

ঝণ্টু। তবে কি পুলিশ?

নিশীথ। না, সেরকম তো কিছু করিনি। যেই হোক, দাঁড়া এইখানে।

নির্মলের প্রবেশ।

নির্মল। যাক, ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি, তোদের দেখা পেয়ে গেলাম।

নিশীথ। কি ব্যাপার নির্মল, তুই এখন এখানে?

নির্মল। তোদের কাছেই এলাম।

নিশীথ। আমাদের কাছে! তা হঠাৎ এই অধমদের কাছে কি মনে করে?

নির্মল। আমি একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।

ঝণ্টু। প্রশ্ন? মানে কোশ্চেন?

নির্মল। হ্যাঁ।

নিশীথ। বল্, নিশ্চয়ই এ্যানসার দেব।

নির্মল। কণাকে তুই কি বলেছিস?

নিশীথ। কই, কিছু নয় তো!

নির্মল। মিথ্যে বলবি না। মিথ্যে বললে—

নিশীথ। ওরে কে আমার সত্যবাদী এল রে!

ঝণ্টু। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

নির্মল। [রাগত স্বরে] ঝণ্টু!

ঝণ্টু। চোখ রাঙিয়ে কথা বলবি না নির্মল।

নিশীথ। ভাল চাস তো কথা না বাড়িয়ে লক্ষ্মীছেলের মত এখান থেকে সরে পড়্।

নির্মল। আমি জানতে চাই, কণাকে তুই কেন অশ্লীল ভাষায় কথা বলেছিস?

নিশীথ। বেশ করেছি, আমার ইচ্ছে হয়েছে বলিছি। প্রয়োজনে আরও বলব, তাতে তোর কি?

ঝণ্টু। কণা তো আর তোর বোন বা বিয়ে করা বৌ নয়, তাকে নিয়ে তোর অত মাথা ঘামাবার কি আছে?

নির্মল। মুখ সামলে কথা বলবি ঝণ্টু!

ঝণ্টু। আরে যা—যা, তোর মত অনেক চাদুকে আমাদের দেখা আছে।

নির্মল। ছিঃ-ছিঃ! তোরা যে এত নিচে নেমে যাবি, এ আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি। তোরা না শিক্ষিত ভদ্রসন্তান? অথচ এই তোদের পরিচয়?

নিশীথ। আমাদের পরিচয় যখন জানতে পেরেছিস, ভালয় ভালয় এখান থেকে কেটে পড়্, নইলে—

নির্মল। কি করবি?

ঝণ্টু। দেখতেই পাবি।

নিশীথ। একদিন তোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। তাই এখনও তোর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। অন্য কেউ হলে—

নির্মল। চুপ কর্, তোরা যে আমার সহপাঠী ছিলি, আমরা যে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, একথা ভাবতে আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে।

নিশীথ। তুই কি আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিস নির্মল ?

নির্মল। না। শুধু যা সত্য তাই বলছি। একটু ভেবে দেখ্, তোরা যে পথে এসেছিস, এ পথ মানুষের চলার পথ নয়।

ঝণ্টু। থাক্, তোকে আর বড় বড় বুলি আওড়াতে হবে না। তোর মত যদি বাবার হোটেলে খেতে পেতাম, আমরাও বড় বড় বুলি আওড়াতে পারতাম।

নির্মল। বাবার হোটেলে খেতে পাসনি বলে নিজেদের মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে হবে ? কেন, এই শক্ত-সামর্থ্য শরীর নিয়ে মোট বইতে পারতিস না ? রিক্সা টানতে পারতিস না ?

ঝণ্টু ও নিশীথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নিশীথ। দে ঝণ্টু, এক বোতল মাল এনে দে ওকে—মাথা ঠাণ্ডা করুক, বড্ড ভুল বকছে।

ঝণ্টু। কি রে, দেব এনে ?

নির্মল। তোদের স্পর্ধা দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

নিশীথ। যা—যা এখান থেকে। আমাদের কাছে বক্‌বক্ করে তোকে আর নীতিবাক্য শোনাতে হবে না।

নির্মল। তার মানে, তোরা একেবারে নরকের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিস।

নিশীথ। তাতে তোর কি ?

নির্মল। না, আমার কিছু নয়। তবে তোদের একদিন ভালবাসতাম

আর সেই ভালবাসার তাগিদেই আমি তোদের লাষ্ট ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি—এটা রাস্তা, জনসাধারণের চলার পথ, এখানে দাঁড়িয়ে কোন-রকম মস্তানী করা চলবে না।

ঝণ্টু। নির্মল!

নির্মল। সন্ধ্যের পর কোন লোক এখানে দিয়ে নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারে না, তাদের সর্বস্ব ছিনতাই হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্য দিনের বেলায় মেয়েদেরও পর্যন্ত নানাভাবে হয়রাণি করা হয়।

নিশীথ। তুই কি ভাবছিস, তোর ভয়ে আমরা শান্ত ছেলের মত চুপ করে ঘরের কোণে বসে থাকব?

নির্মল। হ্যাঁ, বসে থাকতে হবে, নইলে—

নিশীথ। কি করবি?

নির্মল। আমি তোদের যমালয়ে পাঠিয়ে দেব।

নিশীথ। তার আগে তোকেই যমালয়ে যেতে হবে।

[নিশীথ চোখের ইশারা করিল ঝণ্টুকে এবং একসঙ্গে ছুরি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে নির্মলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নির্মলও এক-পা এক-পা করিয়া পিছাইয়া যাইতে লাগিল]

ঝণ্টু ও নিশীথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নিশীথ। এখান থেকে আর তোকে ঘরে ফিরে যেতে হবে না চাঁদু।

ঝণ্টু। এখুনি তোর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।

[দুইজনেই ছুরি মারিতে উদ্যত হইতেই, সহসা নির্মল ঝণ্টুর পেটে লাথি মারিল, সে দূরে ছিটকাইয়া পড়িল, নিশীথ হতভম্ব হইয়া গেল। সেই সুযোগে নিশীথের হাত ধরিয়া ছুরিটি কাড়িয়া

লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল নির্মল, এদিকে ঝণ্টু উঠিয়া
পিছন দিক হইতে নির্মলের কোমরে লাথি মারিল, টাল
সামলাইতে না পারিয়া নির্মল মাটিতে পড়িয়া গেল।
ঝণ্টু ও নিশীথ পুনরায় ছুরি মারিতে উদ্যত
হইল, সহসা টর্চের আলো
আসিয়া পড়িল]

ঝণ্টু। নিশীথ! টর্চের আলো। এদিকে কে আসছে, পালিয়ে আয়। হ্যারি আপ!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

ডাক্তারী ব্যাগ হাতে আলোকের প্রবেশ।

আলোক। [টর্চ জ্বালিয়া] কে—কে ওখানে পড়ে? আরে, নির্মল-বাবু যে! আপনি এখানে?

নির্মল। [উঠিয়া] হ্যাঁ, শয়তান-দুটো আমাকে—

আলোক। আক্রমণ করেছিল? এই তো—এই তো দুজন ছুটে পালিয়ে গেল। তবে কি ওরাই—

নির্মল। হ্যাঁ। হাতে কিছু না থাকায় শয়তান-দুটোকে শায়েস্তা করতে পারলাম না।

আলোক। যাক, আপনার কোথাও চোট লাগেনি তো?

নির্মল। না, তবে আপনি সময়মত এসে না পড়লে হয়তো কিছু ঘটত।

আলোক। ভগবান রক্ষা করেছেন।

নির্মল। কোথায় যাবেন এখন?

আলোক। মিত্রপাড়ায়। রমেশবাবুর স্ত্রীর ভীষণ অসুখ।

নির্মল। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আলোক। আপনি—

নির্মল। আসুন। গল্প করতে করতে দুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

আলোক। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বীরেনের বাড়ি

কথা বলিতে বলিতে গীতা ও লতার প্রবেশ।

গীতা। না রে, এবার আমি যাই।

লতা। তখন থেকে এসে অবধি শুধু যাই যাই করছিস। কি কি ব্যাপার বল্ তো?

গীতা। অনেকক্ষণ তো এসেছি।

লতা। কোথায় অনেকক্ষণ এসেছিস, এখনও আধঘণ্টা হয়নি। মা মন্দিরে পূজো দিতে গেছে, ফিরে এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে তারপর যাবি।

গীতা। আজ আর নয় লতা, আমি বরং অন্য একদিন এসে জেঠাইমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

লতা। হ্যাঁ, তুই তো আমাদের বাড়ি রোজই আসিস। আজ রাস্তা থেকে জোর করে টেনে আনলাম, তাই এলি।

গীতা। আসলে আমি একদম সময় পাই না।

লতা। সময় কি করে পাবি বল্! এখন তুই সবসময় পলাশদার চিন্তায় বিভোর, বাইরের দিকে তাকাবার তোর অবকাশ কোথায় ?

গীতা। এই, ফাজলামো করবি না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না।

লতা। মোটেই না। আমি একটুও ফাজলামো করছি না। শুধু যা সত্যি তাই বলছি।

গীতা। থাক। তোকে আর সত্যি কথা বলতে হবে না।

লতা। রাগ করলি ?

গীতা। কার ওপর ?

লতা। আমার ওপর ?

গীতা। না রে না, তোর ওপর কি রাগ করতে পারি। কারণ তুই যে আমার--

লতা। কি হলো, চুপ করে গেলি কেন ? বল্--

গীতা। শোনার যে খুবই আগ্রহ দেখছি। তবে এবার একটা সত্যি কথা বলেই ফেলি। কি রে, বলব তো ?

লতা। নিশ্চয়ই বলবি।

গীতা। বেশ, তবে বলি। আচ্ছা, তোর চোখের সামনে সবসময় একজনের মুখ ভেসে বেড়ায়, তাই না ?

লতা। মুখ !

গীতা। শুনে যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লি।

লতা। না—মানে, আমি তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

গীতা। বুঝতে পারছিস না, না কি বুঝেও না বোঝার ভান করছিস ?

লতা। গীতা !

গীতা। এই যে আমাকে বাড়িতে ডেকে এনে এত আদর-আপ্যায়ন করলি, এসব কিসের জন্য শুনি ?

লতা। বা-রে, ছেলেবেলা থেকেই যে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।

গীতা। আমি তা স্বীকার করি, তবে তার সঙ্গে তুই যে আরও একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছিস, সেটা আমার অজানা নেই।

লতা। আমি—

গীতা। তুই মনে-প্রাণে ভালবাসিস আমার পরম পূজনীয় দাদা শেখর চৌধুরীকে।

লতা। গীতা !

গীতা। বন্ধু থেকে আমি তোর ননদ হবো। কিন্তু লতা, মনে হয় সে সৌভাগ্য আমার কোনদিনই হবে না।

লতা। একথা বলছিস কেন ?

গীতা। তোদের সঙ্গে আমাদের কোনদিক দিয়েই তুলনা হয় না। তুই ধনীর মেয়ে, ধনীর ঘরেই তোকে মানাবে, আমাদের ভাঙা ঘরে তোকে মানাবে না। তাছাড়া তুই তো জানিস দাদার অসুখ।

লতা। আমি সবই জানি. আর সব জেনেই শেখরদাকে আমি ভালবেসেছি। শেখরদা নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। তার জন্য আমি কত ঠাকুরের কাছে মানত করেছি। যতকিছু বার-ব্রত আছে, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি।

গীতা। লতা ! তুই—

লতা। আমি ধন-ঐশ্বর্যকে ভালবাসিনি, ভালবেসেছি একজন আদর্শ মানুষকে। আমার সেই আদর্শ মানুষ তোর দাদা। তার পায়ে মাথা রেখেই আমার এই জীবনটা আমি কাটাব। তাতে যত দুঃখই আসুক, আমি তা হাসিমুখে বরণ করে নেব।

গীতা। লতা!

লতা। আমি ভিখারিণীর মত তোদের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াব, তুই পারবি না আমাকে তোর দাদার বৌ বলে বরণ করে ঘরে তুলতে! বল্ না—পারবি না?

গীতা। আ-আমি—আমি তোকে চিনতে পারিনি রে লতা, আমি তোকে চিনতে পারিনি। আমাকে তুই ক্ষমা কর্ ভাই!

লতা। একটু দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি, তোকে একটা মজার জিনিস দেখাব। চলে গেলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

গীতা। একেই বোধহয় বলে প্রকৃত ভালবাসা। এই ভালবাসার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় তার নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ করে না।

বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। আমি দ্বিধাবোধ করি, অর্থহীন মানুষকে আমি মানুষ বলে মনেই করি না। [হঠাৎ গীতাকে দেখিয়া] তুমি—

গীতা। হ্যাঁ। মানে, লতা আমাকে—

বীরেন। জোর করে ধরে এনেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আসবে, মাঝে মাঝে এই বাড়িতে তুমি আসবে।

গীতা। আমি—

বীরেন। হ্যাঁ, তুমি। সত্যি গীতা, আগের চেয়ে তোমার চেহারাটা অনেক সুন্দর হয়েছে। তাকালে চোখ ফেরানোই যায় না। মনে হয় এই রূপ, এই যৌবন—

গীতা। [গায়ের কাপড় টানিয়া ধরিয়া] আপনি—

বীরেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৃথা চেষ্টা। এইভাবে দুরন্ত যৌবনকে আটকে রাখা যায় না গীতা। মুনি-ঋষিরা পারেননি সংযমের বাঁধ দিয়ে তাদের যৌবনকে আটকে রাখতে। আর আমরা তো সামান্য মানব, আমরা কি করে পারব বলো?

গীতা। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। আমি চলি।

বীরেন। এত তাড়াতাড়ি কেন? কোন মেয়েকে তার রূপের প্রশংসা করলে, সে নিজেকে গরবিনী মনে করে। আমার মুখে রূপের প্রশংসা শুনে এই মুহূর্তে তোমার কি তা মনে হচ্ছে না?

গীতা। না। আমাকে আর পাঁচটা মেয়ের পর্যায়ে ফেলে আপনি ভুল করছেন।

বীরেন। ভুল কি ঠিক, সে বিচার পরে হবে। [এক বাণ্ডিল টাকা বাহির করিয়া] এই নাও, এই টাকাগুলো তোমার কাছে রাখ।

গীতা। টাকা—

বীরেন। হ্যাঁ। এই টাকা দিয়ে কয়েকখানা ভাল শাড়ি-ব্লাউজ আর তোমার যা-যা প্রয়োজন কিনে নিও। এ-সাজে তোমায় ঠিক মানায় না গীতা।

গীতা। আমি চাই না সেজেগুজে অপরের চোখে নিজেকে মোহময়ী করে তুলতে। আমার এ সাজই ভাল। [প্রস্থানোদ্যতা]

বীরেন। টাকা তাহলে—

গীতা। আপনার কষ্টার্জিত ওই টাকাগুলো আমাকে না দিয়ে কোন মহৎ কাজে ব্যয় করবেন। তাতে আপনি আর কিছু না পেলেও, ভগবানের করুণা লাভ করবেন।

[প্রস্থান।

বীরেন। করুণা—ভগবানের করুণা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এযুগে যার

অর্থ আছে, সেই তো ভগবান। গীতা! ভগবানের করুণা লাভ আমায় করতে হবে না। তোমায় ছুটে আসতে হবে আমার করুণার দ্বারে।

লতার পুনঃ প্রবেশ।

লতা। জানিস গীতা! জিনিসটা কোথায় যে রেখেছি, খুঁজে পেলাম না।

বীরেন। কি জিনিস?

লতা। না, ও কিছু নয়। গীতা এখানে ছিল, কোথায় গেল দাদা?

বীরেন। সে বাড়ি চলে গেছে।

লতা। চলে গেছে! আমাকে না বলে—

বীরেন। আমাকে বলে গেছে। আজ ওর একটু তাড়াতাড়ি আছে, কোথায় যাবে। অন্য আবার একদিন আসবে।

লতা। [বিমর্ষভাবে] ও—আচ্ছা।

[প্রস্থান।

বীরেন। গীতা! তোমার ওই যৌবনভরা দেহসম্ভার আমার জন্য। তোমার যৌবন-সমুদ্রে সাঁতার কাটব আমি। হ্যাঁ, শুধু সাঁতারই কাটব, তবে লোনা জল খাব না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

সতীনাথের বাড়ি

তারিণীর প্রবেশ।

তারিণী। কোন কথা শুনব না, আজ টাকা না নিয়ে আমি এখান থেকে এক-পা নড়ছি না। (উদ্দেশ্যে) কই হে সতীনাথ! সতীনাথ আছ বাড়িতে? সতীনাথবাবু! দয়া করে একবার দেখা দেবেন।

শেখরের প্রবেশ।

শেখর। বাবাকে খুঁজছেন জেঠামশাই?

তারিণী। হ্যাঁ। মহাপুরুষটি কোথায়?

শেখর। বাবা তো বাড়িতে নেই।

তারিণী। নেই, না আমার গলা শুনে ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে আছে?

শেখর। কি বলছেন জেঠামশাই!

তারিণী। কি বলছি শুনতে পাচ্ছো না? না কি তুমিও আজকাল তোমার বাবার মত কানে তুলো দিয়ে রাখছো। ভালো, বাবার পথ অনুসরণ করা খুব ভালো।

শেখর। তার মানে!

তারিণী। মানে অতি সোজা। আমি টাকার তাগাদায় এলেই তোমার বাবা কর্পূর হয়ে উবে যায়। যদি বা ভাগ্যক্রমে কোনদিন দেখা পেয়ে যাই, আমার কথা সে তো কানেই তোলে না। ভাবে, আমি বুঝি তার সঙ্গে রসিকতা করছি।

শেখর। না জেঠামশাই, আমাদের সংসারের অবস্থা বর্তমানে খুবই খারাপ।

তারিণী। তোমাদের সংসারের অবস্থা খারাপ তো আমি কি জানি! আমি তো আর দানসত্র খুলে বসিনি যে, টাকাটা তোমাদের ছেড়ে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করব! না-না, এতখানি দয়ালু আমি নই বাবাজী। আমি টাকা ধার দিয়েছি, সুদ সমেত সমস্ত টাকা বুঝে নেব, একটা কাণাকড়িও ছেড়ে দেব না। যাও বাবাজী, লক্ষ্মীছেলের মত বাবাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসো।

শেখর। জেঠামশাই! বাবা বাড়িতে থাকলে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করত। আমরা আপনার টাকা ধার নিয়ে সময়মত শোধ করতে পারিনি সত্য, কিন্তু তাই বলে আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি না।

তারিণী। বাঃ—বাঃ, বাবার মত-তুমিও বেশ ভালই লেকচার দিতে শিখেছ। হবে না! বাবাগুণে ছেলে তো। তা এক কাজ কর না বাবাজী, এই ফাঁকা মাঠে লেকচার না দিয়ে কিছু দাঁতের মাজন নিয়ে হাটের রাস্তায় দাঁড়িয়ে লেকচার দিলে দু'পয়সা পকেটে আসবে। আর তাতে সংসারটাও কোনরকমে চলে যাবে।

শেখর। জেঠামশাই!

তারিণী। উপযুক্ত ছেলে বাপের ঘাড়ে বসে খেতে লজ্জা করে না? বাপ তো ধার-দেনা করে লেখাপড়া শেখাতে কসুর করেনি। ছিঃ-ছিঃ, এমন অকর্মণ্য ছেলে—

শেখর। হ্যাঁ, অকর্মণ্য। ঠিকই বলেছেন জেঠামশাই, আমার মত অকর্মণ্য ছেলে বোধহয় খুব কম সংসারেই আছে। কেন যে ভগবান আমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল জানি না। তাই সারাজীবন শুধু বাবার চোখের জলই দেখতে হবে। আমি কি কোনদিনই পারব না চোখের জল মুছিয়ে বাবার দুঃখের ভার লাঘব করতে? [কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

তারিণী। তুমি—

শেখর। এই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি বাঁচতে চাই না। ওগো মৃত্যুদেবতা! যে কালব্যাধিতে আমি পড়েছি, সেই কালব্যাধিতেই তুমি আমার মৃত্যু দাও। আমি মরতে চাই—মরতে চাই!

তারিণী। মরণ তো আর চাইলেই হবে না। সময় যখন হবে, ভগবান ঠিক ডেকে নেবে। শোন, তোমার বাবা ভদ্রলোকটিকে বলবে, আমি এসেছিলাম, শিগগীর যেন আমার টাকার ব্যবস্থা করে। আমি বলেই এখনও সময় দিচ্ছি। অন্য কেউ হলে তোমাদের এতদিনে বাড়ি থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিত, বুঝলে? [প্রস্থানোদ্যত]

শেখর। একটা কথা বলছিলাম—

তারিণী। কি কথা?

শেখর। আমি অকর্মণ্য, আমার কিছুই করবার নেই। তবে এই অকর্মণ্য করজোড়ে আপনাকে শুধু এই মিনতি জানাচ্ছে, আপনি দয়া করে বাবাকে আরও কিছুদিন সময় দিন। আমার বাবা জীবনে কাউকে ঠকায়নি আর আপনাকেও ঠকাবে না।

তারিণী। আ-হা, কি মধুর কথাই শোনালে বাবাজী। প্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল। আমি সুদের কারবার করছি, এইভাবে দয়ামায়া দেখাতে গেলে কারবার আমার লাটে উঠবে। না-না, আর বেশিদিন

সময় দিতে আমি পারব না। এখন আমি যাচ্ছি, পরে আবার একদিন আসব। টাকা কিভাবে আদায় করতে হয়, আমি তা ভালভাবেই জানি।

[প্রস্থান।

শেখর। টাকা—টাকাই মানুষের মেরুদণ্ড। টাকা না থাকলে মানুষ সোজা হয়ে দাড়াতে পারে না। সমাজের গরীব মানুষদের ধনীরা দু'পায়ে মাড়িয়ে যায়। আমরা যেন আবর্জনার স্তূপে পড়ে থাকা ছেঁড়া কাগজ, আমাদের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিরাশার অন্ধকারে মাথা কুটে মরি একটু আলো দেখবার জন্য। বিনিময়ে পাই আঘাত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তবুও আমাদের বেঁচে থাকার বাসনা প্রবল।

পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। বেঁচে থাকতে সকলেই চায় রে শেখর। একটা পথের ভিক্ষুকও লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে বেঁচে থাকতে চায়। জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ—সেও বেঁচে থাকতে চায় এই রূপ-রস ভরা পৃথিবীতে। জগতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কত উন্মাদনা।

শেখর। সত্যিই তাই। যে জীবন কালের নিয়মে সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে একদিন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে, সেই জীবনকে ধরে রাখার জন্য মানুষ কত লালায়িত। শুধু কি তাই! একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করে গড়ছে নিজেদের ধন-সম্পদের পাহাড়। তারা একটিবারও ভেবে দেখছে না, তাদের এই হীন কাজ সুন্দর পৃথিবীটাকে কত বিষাক্ত করে তুলছে।

পলাশ। সব মানুষই যদি সৎ হতো, তাহলে আমাদের দেশটা

স্বর্গে পরিণত হতো। থাকত না স্বার্থের হানাহানি, থাকত না ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য। যাকে ওসব কথা। এখন কেমন আছিস বল্।

শেখর। হাঃ-হাঃ-হাঃ----

পলাশ। হাসছিস যে।

শেখর। তোর কথা শুনে। যে রাজরোগে আমি আক্রান্ত হয়েছি তা থেকে কোন গরীবের ছেলে রেহাই পায় না।

পলাশ। তুই অত ভেঙে পড়িস না শেখর। আমি বলছি, তুই একদিন নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবি।

শেখর। সান্ত্বনা দিচ্ছিস?

পলাশ। শেখর!

শেখর। এইভাবে সান্ত্বনা দিয়ে আমাকে আর বেশিদিন তোদের মধ্যে রাখতে পারবি না পলাশ। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার জীবন-গাড়ির চাকা স্তব্ধ হয়ে আসছে। তোদের ছেড়ে—এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাকে চলে যেতে হবেই। আমার দুঃখ শুধু একটাই--

পলাশ। তুই চুপ করবি? এইভাবে বললে আমি আর কোনদিন তোর সামনে আসব না। রোগ তো মানুষেরই হয়। তাই বলে কেউ রোগমুক্ত হয় না?

শেখর। এইভাবে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে—

পলাশ। না রে না, সান্ত্বনা নয়, তোর জীবনের এখনও সবই যে বাকি। ঈশ্বর এত নিষ্ঠুর নয় যে, ফুলটা প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে অকালে বৃন্তচ্যুত করে মালীর বুক ব্যর্থতার হাহাকারে ভরিয়ে দেবে।

শেখর। পলাশ!

পলাশ। কাকাবাবু তোর মুখের দিকে চেয়ে জীবন-সংগ্রামে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে চলেছেন। তোকে ঘিরে কাকাবাবুর কত সাধ—কত স্বপ্ন—তুই সুস্থ হয়ে উঠবি, সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিবি। মরুময় এই সংসার মরূদ্যান হয়ে দেখা দেবে, বইবে শান্তির নির্ঝর।

শেখর। ওভাবে আমাকে বাঁচার লোভ দেখাসনি, তাহলে পাগল হয়ে যাব রে, পাগল হয়ে যাব।

পলাশ। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা তোর মনে আছে শেখর? "মরিতে চাহি না আমি এই সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই!"

শেখর। হ্যাঁ, আমিও তো বাঁচতে চাই, কিন্তু এভাবে নয়, একটা সুস্থ সুন্দর জীবন নিয়ে। আমারও তো ইচ্ছা যায়, বাবার মাথার দুঃখের বোঝাটাকে নামিয়ে তাকে ভারমুক্ত করে একটু শান্তি দিতে। ইচ্ছা যায়, একমাত্র আদরের বোন গীতার সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে। কিন্তু পারলাম না—আমি কিছুই পারলাম না। হেরে গেলাম—আমি হেরে গেলাম! [অশ্রু নামিল]

পলাশ। না, তুই হারিসনি, জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার সময় এখনও অনেক আছে। আগে তুই সুস্থ হয়ে ওঠ্, সুস্থ শরীর না হলে লড়াই করবি কোন্ শক্তিতে? কি করে ছিনিয়ে আনবি সুখের জয়মালা?

শেখর। আমি যে সব আশা হারিয়ে ফেলেছি রে। নিরাশার বালুচরে পড়ে শুধু গুমরে গুমরে কেঁদে দু'চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছি। পলাশ, তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু, আমার একটা কথা রাখবি ভাই!

পলাশ। বল্।

শেখর। গীতা তোকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। অবশ্য তুই গীতাকে কতটুকু ভালবাসিস জানি না। তবে আমি তোর হাত ধরে মিনতি করছি, আমার অভাগিনী বোন গীতাকে তোর পায়ে ঠাঁই দিস ভাই। বল্—দিবি তো?

পলাশ। তোকে কথা দিলাম শেখর! গীতাকে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। তবে তোকেও একটা কথা দিতে হবে।

শেখর। বেশ, বল্।

পলাশ। আজেবাজে কোন চিন্তা করে শরীরকে তুই কষ্ট দিতে পারবি না।

শেখর। না রে না, গীতার স্বপ্ন যখন সার্থক হবে, তখন আর আমি কোন চিন্তা করব না। জানিস পলাশ, এই মুহূর্তে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এত আনন্দ আমি বুকে ধরে রাখতে পারছি না! মনে হচ্ছে, প্রাণ খুলে হাসি—শুধু হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পলাশ। এই হাসি যেন সব সময় তোর মুখে দেখি শেখর! কোন সময় যেন বিষাদের কালোছায়া না নেমে আসে। হাসি-কান্না ভরা এই পৃথিবীতে অনেক চোখের জলই ফেলেছিস, আর চোখের জল নয়, এবার মুখের এই হাসি চির-অক্ষুণ্ণ রেখে দুঃখের বোঝা কিছুটা লাঘব কর্। [প্রস্থানোদ্যত]

শেখর। পলাশ!

পলাশ। দুঃখ মনের মধ্যে পুষে রাখলে শুধু আঘাতই দেয়, ক্ষত-স্থানে সান্ত্বনার প্রলেপ দেয় না।

[প্রস্থান।

শেখর। দুঃখের সাগর পার হয়ে সুখের কিনারায় পৌঁছাতে তো আমি চাই। কিন্তু কেমন করে পৌঁছাব? আমি যে সাঁতার জানি না।

লতার প্রবেশ

লতা। [ধীরকণ্ঠে] শেখরদা!

শেখর। লতা! তুমি—

লতা। আমাকে দেখে যে অবাক হয়ে গেলে!

শেখর। না, মানে

লতা। একটু দাঁড়াও, মায়ের প্রসাদী ফুলটা তোমার কপালে ঠেকিয়ে নিই। [কপালে ফুল ঠেকাইল]

শেখর। পূজো দিয়েছিলে?

লতা। হ্যাঁ। তুমি যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। নাও, এবার হাঁ কর, মা কালীর প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে দিই।

শেখর। আ-আমি—

লতা। হাঁ করো বলছি! [শেখর হাঁ করিল, লতা তাহার মুখে প্রসাদ দিতেই খাইয়া অবাক-বিস্ময়ে লতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল] আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ অমন করে?

শেখর। তোমাকে যতই দেখছি, ততই যেন নতুন করে চিনছি। লতা—

লতা। বলো।

শেখর। আমার জন্য সাধ করে কেন তুমি দুঃখকে বুকে তুলে নিতে চাইছ? আমাকে ভালবেসে তুমি কিছুই পাবে না।

লতা। তোমাকে পেলে সেইটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া, আমি আর কিছুই চাইব না।

শেখর। তা কি করে সম্ভব লতা! তোমার জগত আর আমার

জগত যে সম্পূর্ণ আলাদা। তোমাদের বিশাল জগতের আলো আমাদের ক্ষুদ্র জগতে এসে কোনদিন পৌঁছবে না। আমাদের সাধ-স্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হয়ে ক্ষুদ্র জগতের চারপাশে ঘুরে বেড়াবে, কোনদিন বাস্তবে পরিণত হবে না।

লতা। তাহলেও তোমাদের ক্ষুদ্র জগতে এসে তোমাকে আশ্রয় করে আমি বাঁচতে চাই শেখরদা।

শেখর। তুমি চাইলেই তো হবে না। তোমার দাদা আভিজাত্য খুইয়ে তার বোনকে নিশ্চয়ই আমার মত একটা অপগণ্ডের হাতে তুলে দিতে রাজী হবে না।

লতা। দাদা রাজী হওয়া না হওয়ায় কিছু যায় আসে না। আমার মনের দেবতা যেখানে থাকবে, আমিও সেখানে থাকব।

শেখর। লতা!

লতা। আমি ধন-ঐশ্বর্যকে ভালবাসিনি, ভালবেসেছি তোমাকে, তোমাকে নিয়েই বাঁধব শান্তির নীড়।

শেখর। কিন্তু আমার যে মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে। এই অসুখ নিয়ে

লতা। অসুখ মানুষের চিরদিন থাকে না, তুমি নিশ্চয় সুস্থ হয়ে উঠবে। আর তোমাকে সুস্থ করে তোলাই হবে আমার জীবনের প্রথম কাজ।

শেখর। লতা!

লতা। মায়ের মুখে শুনেছি, তোমাদের এই দারিদ্র্যতার জন্য দায়ী আমার বাবা। তোমাদের ঠকিয়ে সর্বস্ব বাবা গ্রাস করেছেন। সেইজন্য মাঝে মাঝে মনটা আমার বিদ্রোহ করে ওঠে, স্বর্গগত বাবাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে ঘৃণা জানাতে ইচ্ছা করে।

শেখর। অতীত অতীতেই চাপা পড়ে থাক, তাকে বর্তমানে টেনে এনে মিছিমিছি মনকে কষ্ট দিও না।

লতা। বাবার সেই অপরাধের শাস্তি তুমি আমাকে দেবে না তো শেখরদা? তোমার অন্তর থেকে আমাকে কোনদিন দূরে সরিয়ে দেবে না তো?

শেখর। লতা! আমি—

লতা। তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিলেও, আমি কোনদিন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাব না। তোমার ভালবাসার রুদ্ধদ্বারে আমার নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রতীক্ষা করব। আমি জানি, আমার চোখের জলে তোমার রুদ্ধদ্বার একদিন খুলবে—খুলতেই হবে।

[অশ্রুভরা কণ্ঠে প্রস্থান।

শেখর। কত রকমের মানুষ এই পৃথিবীতে বিচরণ করছে। কেউ চায় ভালবেসে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করতে, আবার কেউ চায় ভালবেসে বুকে ছুরি বসিয়ে সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে

ক্লান্তপদে সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। না-না, সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে উঠতে আমি চাই না। আমি চাই সংসারটাকে কোনরকমে বাঁচাতে, সকলে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে। এর বেশি কিছু নয়, এর বেশি কিছু নয়।

শেখর। বাবা!

সতীনাথ। এই দেখ, আবার তুই বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিস? না-না, এভাবে ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করিসনে বাবা।

শেখর। সারাদিন তুমি কোথায় ছিলে বাবা?

সতীনাথ। কোথায় আবার থাকব! ওই ঘোষপাড়ায় বেড়াতে

গিয়েছিলাম। সবসময় বাড়িতে বসে থাকতে তো ভাল লাগে না, তাই গিয়েছিলাম।

শেখর। দুপুরে নিশ্চয়ই তোমার খাওয়া হয়নি?

সতীনাথ। খাওয়া হবে না কেন? হারাধন ঘোষ আজ আমায় পেট পুরিয়ে খাইয়েছে।

শেখর। হারাধন ঘোষ তোমায় খাইয়েছে—একথা আর কেউ বিশ্বাস করলেও, আমি কখনই বিশ্বাস করব না। আমি জানি, হারাধন ঘোষের মত ধনকুবের লোকেরা—

সতীনাথ। এই দেখ, আমি কি তবে তোকে মিথ্যে বলছি? এমনও তো হতে পারে, আমার শুকনো মুখ দেখে তার খুব মায়া হলো, আমাকে ডেকে আদর-আপ্যায়ন করে ভাল-মন্দ খাওয়ালে।

শেখর। না বাবা, ওদের অন্তরে মায়া-মমতা বলে কোন বস্তু নেই। ওরা শুধু জানে গরীবের রক্ত শোষণ করে নিজেদের সিন্দুকে টাকা ভরতে। ওদের অবশিষ্ট খাবার ওরা নর্দমায় ফেলে দেয়, তবু আমাদের মত গরীবকে ডেকে খাওয়ায় না। কারণ ওরা জানে, আমরা বেঁচে থাকলে একদিন ওদের টুঁটি চেপে ধরব, তাই ওরা চায় না আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে।

সতীনাথ। শেখর!

শেখর। তুমি আমার কাছে গোপন রাখলেও, আমি জানি তুমি ঘোষপাড়ায় বেড়াতে যাওনি, বেরিয়েছিলে টাকার সন্ধানে। বলো, আমার কথা ঠিক কিনা!

সতীনাথ। হাঁ—মানে, টাকা—

শেখর। দেয়নি, শুধুহাতে আর কেউ তোমাকে টাকা দেবে না বাবা।

সতীনাথ। হ্যাঁ রে, আমি তা জানি। যতদিন আমার কিছু ছিল, লোকে উপযাচক হয়ে আমাকে টাকা দিয়েছে। আর আজ কাউকে টাকার কথা বললে, শুকনো হাসি হেসে বলে—কি দেখে তোমায় টাকা দেব, তোমার তো আর কিছুই নেই।

শেখর। বাবা!

সতীনাথ। সত্যিই আমার কিছুই নেই। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় আজ আমি রিক্ত—নিঃস্ব—সর্বহারা। এমনকি সাতপুরুষের এই ভিটেটুকু পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে আমাকে টাকা নিতে হয়েছে। এবার তোদের হাত ধরে পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি বিজড়িত এই বাস্তুভিটে ছেড়ে আমাকে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি গাছতলায় গিয়েই দাঁড়াব। ভগবান যখন আমায় কাঙাল সাজিয়েছে তখন আর এই বাস্তুভিটেটুকু বুকে ধরে রেখে মায়া বাড়াব না।

শেখর। বাবা, কিছুক্ষণ আগে তারিণী চক্রবর্তী টাকার তাগাদায় এসেছিল।

সতীনাথ। নিশ্চয়ই আমাকে না পেয়ে তোকে অনেক কটুকথা শুনিয়েছে। নিশ্চয়ই বলেছে, আমার মত জোচ্চোরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে!

শেখর। বাবা!

সতীনাথ। বলবে—তারিণী চক্রবর্তী বলতে পারে না এমন কোন কথা নেই। বুকটা আমার মাঝে মাঝে বড় হাহাকার করে শেখর! আমি বাবা হয়ে তোদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। এমনকি—তোদের আমি আশ্রয়হীন করলাম! এ দুঃখ—এ গ্লানি আমি কোথায় ঢাকব!

শেখর। তুমি—

সতীনাথ। তোর মায়ের কত আদরের তোরা। মরার সময় মালতী আমাকে বলে গিয়েছিল, আমি তো অকালে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার শেখর-গীতা রইল, ওদের তুমি দেখো, আমার অভাব তুমি পূর্ণ করো। ওরা মনে দুঃখ পেলে, আমার অতৃপ্ত আত্মা কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, আমি শান্তি পাব না।

শেখর। বাবা।

সতীনাথ। পারিনি পারিনি আমি তোর মায়ের কথা রাখতে, পারিনি তার আত্মাকে শান্তি দিতে। আমি চোখ বুজলেই দেখি, তোর মা দু'চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে আর আমাকে অভিযোগ জানিয়ে বলছে---আমি নেই বলে আমার শেখর-গীতাকে তুমি এত কষ্ট দিচ্ছো?

শেখর। চুপ করো বাবা, তুমি চুপ করো।

সতীনাথ। চুপ করে থাকতে যে আমি পারছি না রে! আমি তোদের এমনই অকর্মণ্য অপদার্থ বাপ, না পারলাম তোদের দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে, না পারলাম তোদের সাধ-আহ্লাদ পূরণ করতে। আমার মত অক্ষম বাপের মরণই ভালো রে, মরণই ভালো। [কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল]

শেখর। ওকথা বলো না বাবা। আমরা তো কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি! তবে কেন তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছো? তোমার বয়স হয়েছে, এখন আমার কর্তব্য সংসারের সবকিছু দেখাশোনা করা। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না।

সতীনাথ। শেখর!

শেখর। না, আর আমি চুপ করে ঘরে বসে থাকব না, এবার যা-হোক একটা কিছু করব। হোক অসুস্থ শরীর, এই অসুস্থ শরীর

নিয়েই আমি একবার শেষ চেষ্টা করব, মৃত্যুর আগে এই ঘুনধরা সমাজটার সঙ্গে লড়াই করে। [উত্তেজনায় কাশি আসিল]

সতীনাথ। শেখর—শেখর!

[ধরিয়া ফেলিল, উদ্দাম কাশিতে সতীনাথের বুকে শেখর লুটাইয়া পড়িল, শেখরকে ধরিয়া সতীনাথের ধীরে ধীরে প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তারখানা

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। না-না, এভাবে চলবে না—চলতে পারে না। আজ আসুক বাড়িতে, আমি পরিষ্কার বলব—হয় আমার কথা শুনে চলতে হবে, নইলে আমি চলে যাব এখান থেকে।

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। কোথায় যাবে নবীনকা? [নবীন মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল] কি হলো, কথা বলবে না? আমার ওপর রাগ করেছ?

নবীন। রাগ? তোমার ওপর রাগ করতে যাব কেন? আমি তোমার কে? আমার রাগেই বা তোমার কি যায়-আসে? আমি একটা সামান্য চাকর, তোমার আপন তো কেউ নই!

আলোক। না নবীনকা, এই পৃথিবীতে এখন একমাত্র তুমিই আমার আপন, আমার কাছের মানুষ।

নবীন। মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা। আপন ভাবলে, এইভাবে কোনদিন তুমি আমাকে আঘাত দিতে পারতে না।

আলোক। আ-ঘা-ত! আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছি?

নবীন। হ্যাঁ। অনেক—অনেক আঘাত তুমি আমায় দিয়েছ। আচ্ছা, আমিও তো মানুষ! একটা মানুষ কত আঘাত সহ্য করতে পারে বলতে পারো?

আলোক। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমাকে তুমি সব খুলে বলো নবীনকা।

নবীন। বলতে হবে কেন? তুমি তো এত বড় বড় বই পড়ে মস্তবড় ডাক্তার হয়েছ। মানুষ কেন আঘাত পায় তা কি তুমি জান না? না কি জেনেও না-জানার ভান করে আছো?

আলোক। তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে কবে কখন আঘাত দিয়েছি, কিছুই মনে করতে পারছি না।

নবীন। পারবে না। তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবাসতে, ঠিক মনে করতে পারতে। থাকবে না—আমি আর এখানে থাকব না, আজই চলে যাব।

আলোক। রাগ করো না লক্ষ্মী কাকা আমার! বলো, আমি তোমায় কি আঘাত দিয়েছি? [ছোট ছেলের মত নবীনের গলা জড়াইয়া ধরিল]

নবীন। কি দাওনি! সব সময় শুধু রুগী দেখে বেড়াবে, সময়মত চান-খাওয়া করবে না, শরীরের ওপর নির্যাতন করবে। এসব দেখে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? আমাকে তোমার আঘাত দেওয়া হয় না?

আলোক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি ভাবলাম হয়তো সত্যিই অজান্তে কোনদিন তোমায় বিরাট আঘাত দিয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নবীন। হাসছো—আমার কথা শুনে তুমি হাসছো? হ্যাঁ-হ্যাঁ, হাসবেই তো। আমি যে মুখ্যু মানুষ। হ্যাঁ খোকা, আমি ঠিকমত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না সত্যি, কিন্তু তোমার ওপর আমার যে ভালবাসা—সেটা তো সত্যি। আমি মুখ্যু বলে আমার বুকের ভালবাসা তো মিথ্যে নয়!

আলোক। নবীনকা!

নবীন। কর্তা স্বর্গে যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল, খোকা রইল—তুই ওকে দেখিস, সব সময় ওর কাছে থাকবি। ও বড় স্নেহের কাঙাল!

আলোক। নবীনকা!

নবীন। তাই তো তুমি যখন এই গ্রামে এসে ডাক্তারখানা খুললে, আমিও তোমার সঙ্গে চলে এলাম। মরণকালে কর্তাকে কথা দিয়েছিলাম তোমার দেখাশোনা করব, এখন যদি তুমি নিজের খেয়াল খুশিমত চলো, আমাকে সে কথা রাখতে না দাও, তাহলে যে আমাকে মিথ্যেবাদী সাজতে হবে। না-না, এই বুড়ো বয়সে তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী সাজিও না খোকা।

আলোক। সত্যি সত্যিই তুমিই একজন আদর্শ মানুষ নবীনকা!

[সহসা পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল]

নবীন। একি করলে! আবার আজও তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে? সেদিন তোমাকে না কত বারণ করলাম।

আলোক। বারণ করে এসব জিনিস আটকানো যায় না নবীনকা। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের দেখলে আপনা হতেই

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে, বারবার তাদের পায়ে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করে।

নবীন। কিন্তু আমার মত একটা সামান্য চাকরকে—

আলোক। না, আমার কাছে তুমি চাকর নও, তুমি অনেক বড়। আমার হৃদয়ে তোমার স্থান অনেক উঁচুতে।

নবীন। খোকা—

আলোক। বাবার স্নেহ যেমন পেয়েছি, তেমনি তোমারও পেয়েছি অগাধ স্নেহ। তোমার স্নেহসুধায় সঞ্জীবিত হয়েছে আমার দেহ-পল্লব। তাই আমার হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি সব সময়ই আমি তোমার পায়ে অর্পণ করব, কোনদিনই তোমাকে চাকর ভেবে আমার শ্রদ্ধার মন্দির থেকে অশ্রদ্ধার পচা নর্দমায় নামাতে পারব না।

নবীন। বলো না—অমন করে বলো না খোকা, এত আনন্দ—এত সুখ আমার অদৃষ্টে সইবে না। এসো, আমি জল তুলে রেখেছি, হাত-মুখ ধোবে এসো। তাড়াতাড়ি করবে, আমি খাবার জায়গা করতে যাচ্ছি। [কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া] হ্যা খোকা, তখন আমি কথা বলিনি বলে তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো?

আলোক। রাগ! তোমার ওপর রাগ করলে আমার নিজেকেই যে ছোট করা হবে নবীনকা।

নবীন। আসলে আমার বয়স হয়েছে, কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলি। আমার কথায় যেন কোনদিন রাগ করো না খোকা। তুমি রাগ করলে আমি খুব কষ্ট পাব। হ্যা, আর একটা কথা বলছিলাম—

আলোক। বলো।

নবীন। তুমি সময়মত চান-খাওয়াটা করবে, তোমার খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম আমি মোটেই সইতে পারি না।

আলোক। তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই আমার সময়মত খাওয়া না হলে তুমি যেমন কষ্ট পাও, তেমনি আমিও রোগীদের আহ্বান উপেক্ষা করে ঘরে থাকতে কষ্ট পাই। তাদের কাছে সময়মত গিয়ে পৌছতে না পারলে—

নবীন। তাই বলে তুমি—

আলোক। আমি ডাক্তার, নিজের সুখকে বড় করে দেখে রোগীদের আমি কষ্ট দিতে পারি না নবীনকা। তাহলে যে আমার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করা হবে।

নবীন। বেশ, তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম পালন কর, তবে এই বুড়ো মানুষটার কথাও একটু মনে রাখবে। তুমি সময়মত না খেলে আমি মনে বড় কষ্ট পাই—বড় কষ্ট পাই।

[প্রস্থান]

আলোক। নবীনকা ভাবে, আমি এখনও সেই আগের মত ছোটই রয়ে গেছি। ছেলেবেলায় আম খেতে না চাইলে যেমন জোর করে খাওয়াত, আজও ঠিক তেমনি করতে চায়। একেই বোধহয় বলে অন্ধ ভালবাসা।

নিশীথ ও ঝন্টুর প্রবেশ।

নিশীথ। ভালবাসা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ডাক্তারবাবু তাহলে সত্যি-সত্যিই প্রেম-প্রেম খেলায় মেতেছেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আলোক। প্রেম!

ঝন্টু। হ্যাঁ, বিশুদ্ধ প্রেম। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এ জগতে বিশুদ্ধ প্রেম আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

আলোক। আ-আমি—

ঝণ্টু। পারবেন না। শুধু আপনি নন, কেউই পারবে না। বিশুদ্ধ বলে আজকাল কোন জিনিস নেই। সবেতেই শুধু ভেজাল। ভেজালে ছেয়ে গেছে গোটা দেশটা।

নিশীথ। গোটা দেশটা আজ পঙ্গু হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। একটা বড ধরণের ঝড় উঠলেই সব ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

আলোক। আপনারা—

নিশীথ। আমরা এখন আপন দোস্ত, তবে খুব শিগগীরই দুশমন হতে চলেছি।

আলোক। দুশমন?

নিশীথ। হ্যাঁ। আপনি আমার জিনিসে হাত বাড়িয়েছেন, তাই এসেছি আপনাকে সাবধান করে দিতে।

আলোক। সাবধান?

ঝণ্টু। ইয়েস। আপনি ভেবেছেন কণাকে বিয়ে করে সংসারী হবেন। কিন্তু না, কথনই তা হবে না।

নিশীথ। কণাকে আমি ভালবাসি, আমি তাকে বিয়ে করব। কণা শুধু আমার, আর কারও নয়।

আলোক। আমি আপনাদের কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঝণ্টু। খুব যে দিচ্ছেন মশাই! কণার সঙ্গে দিব্যি মাতামাতি করছেন, অথচ বলছেন আপনাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবছেন, তাই না? তবে আমরাও আপনার চেয়ে কম বুদ্ধিমান নই, বুঝলেন? আপনার মহত্ত্বের আবরণে ঢাকা কালো কুৎসিত রূপটাকে আমরা ধরে ফেলেছি।

আলোক। [কঠিন সুরে] আপনারা কি বলতে চাইছেন?

নিশীথ। বলতে চাইছি, শুধু কণাদের বাড়ি যাওয়া আপনাকে বন্ধ করতে হবে।

আলোক। কণা? কে সে?

ঝণ্টু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! সত্যি মাইরী, আপনি একটা অদ্ভুত জিনিস আছেন। এই সবেমাত্র কণাদের বাড়ি থেকে ফিরলেন, কণা আপনাকে রাস্তায় এগিয়ে দিয়ে গেল। তাছাড়া প্রায়ই দেখি, একটা শিশি হাতে কণা এখানে এসে আপনার সঙ্গে গল্পগুজব করে।

নিশীথ। একটা যুবতী মেয়েকে আপনার ডাক্তারখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখেন কোন অধিকারে?

আলোক। দেখুন, আপনারা যেসব কথা বললেন, এর বেশিরভাগই মিথ্যে। আর যে মেয়েটার কথা বলছেন, ওর নাম যে কণা—এটা আমি আপনাদের মুখেই প্রথম শুনলাম।

নিশীথ। [বিদ্রূপের স্বরে] তাই নাকি!

আলোক। হ্যাঁ। ওর বাবার অসুখ, আমি তার চিকিৎসা করতে যাই। রোগীর সঙ্গেই আমার সম্পর্ক, কণার সঙ্গে নয়।

ঝণ্টু। ঠিক আছে। আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করব, যদি এর পরে আপনি আর ওদের বাড়ি না যান।

আলোক। না, আমি যাব। যতদিন না রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, আমাকে যেতেই হবে।

নিশীথ। [কঠিন স্বরে] না, আপনি যাবেন না।

আলোক। আমি ডাক্তার, আমার কর্তব্য রোগের চিকিৎসা করা। আর এই কেসে যখন আমি হাত দিয়েছি, আমাকে দেখতেই হবে। কারও কোন বাধা মানব না।

নিশীথ। বাধা মানলে যে ফষ্টিনষ্টি করা বন্ধ হয়ে যাবে। কণাকে

চোখের সামনে দেখতে না পেলে আপনার পেটের ভাতই যে হজম হবে না।

আলোক। ভদ্রভাবে কথা বলুন। ভদ্রলোকের ছেলে যে এমন অভদ্রভাবে কথা বলতে পারে, এটা আমার জানা ছিল না।

নিশীথ। এবার অনেক কিছুই জানতে পারবেন। আমার ভালবাসার সামগ্রীকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে চাইলে, আমি আপনাকে কিছুতেই ক্ষমা করব না।

আলোক। আপনি—

নিশীথ। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার বুকে আগুন জ্বালালে, সেই আগুনে আমি শুধু একাই পুড়ে মরব না, আপনাকেও পুড়িয়ে মারব, ধূলিসাৎ করে দেব আপনার ভালবাসার স্বপ্ন। অতএব জেনেশুনে নিজের হাতেই নিজের মৃত্যুবাণ তুলে নেবেন না। আয়— চলে আয় ঝণ্টু। [প্রস্থান।

ঝণ্টু। চলি ডাক্তারবাবু! তবে নিশীথ যা বলে গেল, কথাগুলো স্মরণ রাখবেন, বিদেশে এসে নিজের জীবনটাকে বিপন্ন করবেন না।

আলোক। আপনারা নীচ, তাই মানুষকে এমন নীচ ভাবেন।

ঝণ্টু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনার ভালবাসার জিনিস অপরে কেড়ে নিতে চাইলে, আপনিও মহৎ না হয়ে নীচ হতেন ডাক্তারবাবু। সকলেই চায় তার ভালবাসার সামগ্রীকে বুকে আকড়ে ধরে রাখতে।

আলোক। না, সকলেই চায় না।

ঝণ্টু। হ্যা, চায়। আমি—আপনি—পৃথিবীর সকল মানুষই চায়। দাতাকর্ণ, দানবীর হরিশ্চন্দ্র, বীর একলব্য এ যুগে বিরল। এ যুগে কেউই স্বার্থত্যাগ করে না, কেউ না—কেউ না।

[প্রস্থান।

আলোক। আছে—এই পৃথিবীতে স্বার্থপর মানুষ যেমন আছে, তেমনি নিঃস্বার্থ মানুষও আছে। তা যদি না থাকত, আমার এই জীবনটা কবে শেষ হয়ে যেত। যে হতভাগ্য তার বাবা-মাকে—

নির্মলের প্রবেশ।

নির্মল। ওরা নিশ্চয়ই আপনার কাছেই এসেছিল?

আলোক। কারা বলুন তো!

নির্মল। এই যে দুটো শয়তান বেরিয়ে গেল!

আলোক। ও—হ্যাঁ। আচ্ছা, ওরা শিক্ষিত—তাই না?

নির্মল। হ্যাঁ। কিন্তু শিক্ষার মুখে ওরা কলঙ্কের কালি মাখাচ্ছে। শিক্ষিত ভদ্রসন্তান হয়ে হেন কুকাজ নেই, যা করতে ওদের বিবেকে বাধে না।

আলোক। ওদের কি সৎপথে ফিরিয়ে আনা যায় না?

নির্মল। সে চেষ্টা আমি অনেক করেছি, কোন ফল হয়নি। যে মানুষ নিজের শিক্ষা বিবেক মনুষ্যত্বের গলা টিপে খুন করে নরকে পা দিয়েছে, তার কাছে নরকই স্বর্গতুল্য, স্বর্গ যন্ত্রণাদায়ক।

আলোক। সত্যিই তাই, মানুষ যখন তার ন্যায়নীতি-বোধকে মন থেকে জলাঞ্জলি দেয়, তখন পৃথিবীর সবকিছু সুন্দর জিনিসও তার চোখে কুৎসিত দেখায়।

নির্মল। একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?

আলোক। বলুন।

নির্মল। ওরা যে এখানে এসেছিল, নিশ্চয়ই অসম্মান করেছে আপনাকে?

আলোক। হ্যাঁ। না, মানে—

নির্মল। আমি জানি, ওরা আপনাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে পারবে না। কারণ ওদের চরিত্র দিয়েই ওরা সব মানুষের বিচার করে। একটিবারও ভেবে দেখে না—সব মানুষের মন একই ধাতুতে গড়া নয়। সাগর নদী ডোবা সবেতেই জল আছে, কিন্তু ওদের কারও সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না।

আলোক। আপনি—

নির্মল। আমি ওদের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ওদের কোন কথায় আঘাত পেয়ে এই গ্রামবাসীদের আপনি ভুল বুঝবেন না। ওরা দুজনে আপনাকে চিনতে না পারলেও, শিবপুরের প্রতিটি মানুষ আপনাকে চিনেছে। আমরা সকলেই আপনার কাছে ঋণী।

আলোক। নির্মলবাবু!

নির্মল। আপনাকে কাছে পেয়ে আমরা আশার আলো দেখেছি। ওই বিপদধারা জানোয়ার দুটোর ব্যবহারে আমাদের ভুল বুঝে যদি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যান তাহলে সত্যিই আমরা খুব দুঃখ পাব, যে দুঃখে কোনরকম সান্ত্বনা থাকবে না।

আলোক। না নির্মলবাবু, আপনাদের ভালবাসার বাঁধন ছিন্ন করে, এই শিবপুরের মায়া কাটিয়ে আমি কোনদিনই যেতে পারব না। এই ছ'মাসের মধ্যেই আপনাদের গ্রামকে আমি অনেক ভালবেসে ফেলেছি। মনে হচ্ছে এই গ্রামের সঙ্গে আমার কত দিনের—কত জন্মের পরিচয়।

নির্মল। ডাক্তারবাবু!

আলোক। গ্রামকে ভালবেসে আপনাদেরও আমি ভালবেসেছি নির্মলবাবু। আর সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের ভালবাসতে না পারলে আপনাদের রোগের চিকিৎসা কি করে করব বলুন!

নির্মল। আপনি—

আলোক। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন নির্মলবাবু, আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও আমি আপনাদেরই একজন হয়ে থাকব, কোনদিনই আপনাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাব না। কারণ উভয়ের ভালবাসা যেখানে প্রগাঢ়, সেখানে আমি চলে গেলে আপনারাই শুধু কষ্ট পাবেন না, আমিও পাব।

নির্মল। আজ আমি আপনাকে আবার নতুন করে চিনলাম। জানলাম সত্যিই আপনার কোন তুলনা হয় না।

আলোক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অতখানি বলবেন না।

নির্মল। এই দেখুন, কথায় কথায় আসল কথাটাই এখনও আপনাকে বলা হয়নি।

আলোক। কি বলুন।

নির্মল। হিমাদ্রীর মায়ের অসুখটা একটু বেড়েছে।

আলোক। সকালে হিমাদ্রীবাবুর খবর দেবার কথা ছিল, কোন খবর পাইনি বলেই আমি যাইনি।

নির্মল। আসলে সকালে হিমাদ্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

আলোক। ঠিক আছে, আমি এখুনি যাচ্ছি।

নির্মল। না-না, এই সবে ফিরলেন, একটু পরেই না হয়—

আলোক। না নির্মলবাবু, রোগী কষ্ট পাবে আর আমি ঘরে বসে বিশ্রাম নেব, তা হয় না। চলুন—

নবীনের পুনঃ প্রবেশ।

নবীন। আবার কোথায় বেরুচ্ছো? ওদিকে যে তোমাকে খেতে দিয়েছি।

আলোক। একটু অপেক্ষা করো নবীনকা, একটা রোগী দেখেই আমি এখুনি চলে আসব।

নবীন। একটু পরে গেলে চলত না?

আলোক। লক্ষ্মী কাকা আমার, রাগ করো না, আমি যাব আর আসব। আসুন নির্মলবাবু।

[নির্মল সহ প্রস্থান।

নবীন। যাব আর আসব। কখন্ যে আসবে তা আমার আর জানতে বাকি নেই। ঘর থেকে একবার বেরুলে আর ঘরে ঢোকবার নাম থাকে না। আমি কিছু বলতে গেলেই অমনি শুধু এক কথা—আমি ডাক্তার, আমার কর্তব্যকর্ম পালন করতে হবে। করুক, না খেয়ে কর্তব্যকর্ম পালন করুক, আমার কি! আমি আর কিছু বলব না—কিছু বলব না।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বীরেনের বাড়ি

উত্তেজিত বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। এতদূর স্পর্ধা, আমার কথা অমান্য করে! [উচ্চস্বরে] বিশু—বি—

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। আমাকে ডাকছো খোকাবাবু?

বীরেন। হ্যাঁ। কি বলেছিলাম তোকে?

বিশু। আমাকে?

বীরেন। মনে পড়ছে না? মনে পড়বে কি করে! সব সময় শুধু গিন্নিমা আর মামণিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমার কথা মনে থাকবে কেন? শোন বিশু—

বিশু। বল খোকাবাবু।

বীরেন। তোকে এই বাড়িতে থাকতে হলে, আমার কথামত কাজ কাজ করতে হবে।

বিশু। আমি তো তোমার কথামতই কাজ করি খোকাবাবু।

বীরেন। তাহলে আজ করিসনি কেন? বিকেলে বলে গিয়েছিলাম সুরেশের দোকান থেকে দু'বোতল মাল এনে আমার ঘরে রাখতে। আমার সেকথা—

বিশু। না। ওকাজ করতে আমি পারব না।

বীরেন। কেন পারবি না?

বিশু। জেনেশুনে আমি তোমার হাতে বিষ তুলে দিতে পারব না।

বীরেন। বিষ!

বিশু। নয় তো কি! ও জিনিস খেলে মানুষ বেশিদিন বাঁচে না। তাই আমি—

বীরেন। আমার বাঁচা-মরা নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি যা বলব তাই তুই করবি। আমার অবাধ্য হলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেব।

বিশু। [আহত কণ্ঠে] খোকাবাবু!

বীরেন। হ্যাঁ, কথাটা মনে রাখবি।

বিশু। [সজল চোখে] আমি—

বীরেন। বড্ড মাথায় উঠেছিস। ভুলে যাস না, তুই এবাড়ির পোষা কুকুর।

বিশু। পোষা কুকুর হলেও, সে তো বিপদে প্রভুকে সজাগ করে দেয় খোকাবাবু।

বীরেন। তুই—

বিশু। আমি তোমাকে হাতজোড় করে মিনতি করছি, ওইসব ছাই-পাঁশ খেয়ে তুমি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যেও না। তুমি যখন রোজ রাত্রে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘরে ফেরো, গিন্নিমা দূর থেকে শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর একবুক যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে।

বীরেন। মা—

বিশু। মায়ের বুকে আঘাত দিও না খোকাবাবু। যে মা সন্তানের জন্য তিল তিল করে বুকের রক্ত ঝরায়, সেই মায়ের বুকে আঘাত দিয়ে কেউ কোনদিন সুখী হয় না—হতে পারে না।

বীরেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুই কি ভেবেছিস, তোর কাছ থেকে

উপদেশ নিয়ে আমাকে পথ চলতে হবে? নো—নেভার। বীরেন চৌধুরী বাড়ির একটা অশিক্ষিত চাকরের কাছ থেকে উপদেশ নেবে না।

বিশু। অশিক্ষিতরাও এক-এক সময় এমন কথা বলে, যা শিক্ষিতকেও ভাবিয়ে তোলে। শিক্ষিত মানুষ বলেই সে যে সবসময় ঠিক পথে চলবে, ঠিক কথা বলবে, তার তো কোন মানে নেই খোকাবাবু।

বীরেন। ও—তাই বুঝি! পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে। তোরও এখন ঠিক সেই অবস্থা। মরণের আর বেশি দেরী নেই।

বিশু। আ-আমি—

বীরেন। ভাল চাস তো ওড়া বন্ধ কর্। নইলে এই বুড়ো বয়সে এমন মার খাবি, আর কোনদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবি না।

বিশু। খোকাবাবু! তুমি আমাকে—

বীরেন। যা, সুরেশের দোকান থেকে আমার নাম করে দু'বোতল মাল নিয়ে আয়। বেশি দেরী যেন না হয়।

বিশু। আমি পারব না।

বীরেন। পারবি না?

বিশু। না। যে চারাটাকে আমি মহীরুহে পরিণত করছি, আমি পারব না নিজের হাতে কেটে আমার এই বুকখানা ব্যথায় ভরিয়ে তুলতে।

বীরেন। [রাগতস্বরে] বিশু!

বিশু। প্রয়োজন হলে আমার বুকের পাঁজর দিয়ে আমি তোমার স্বর্গের সোপান গড়ে দিতে পারি, কিন্তু নরকের পথ সুগম করে দিতে আমি পারব না। আমাকে তুমি ও আদেশ করো না খোকাবাবু, ও আদেশ করো না।

বীরেন। আমি জানতে চাই, তুই যাবি কি না?

বিশু। না—না—না।

বীরেন। আমার অবাধ্যতার শাস্তি তবে দেখ্। [চুলের মুঠি ধরিয়া উপর্যুপরি কিল চড় মারিতে লাগিল] বল্ আমার আদেশ পালন করবি? বল্—বল্!

বিশু। আঃ, খোকাবাবু—খোকাবাবু! [অঝোরে কাঁদিতে লাগিল]

সহসা বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। বাঃ—চমৎকার! এই না হলে শিক্ষিতের উপযুক্ত কাজ!

বীরেন। আমি—

বিশাখা। ছিঃ-ছিঃ! তুই নিচে নেমে গেছিস জানতাম, কিন্তু তোর যে এতখানি অধঃপতন হয়েছে, আমি তা জানতাম না। লেখাপড়া শিখে তোর শিক্ষা বিবেক মনুষ্যত্বকে তুই নিজের হাতে খুন করলি? আজ তুই যে কাজ করলি, কোন শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের এ কাজ শোভা পায় না।

বীরেন। থাক্, তোমাকেও আর ওর সুরে সুর মিলিয়ে আমাকে উপদেশ দিতে হবে না।

বিশাখা। হ্যাঁ, আজ তুই বড় হয়েছিস, নরকের পথ চিনেছিস, আমাদের উপদেশ তোর ভাল লাগবে কেন? তবে একদিন ছিল, যেদিন আমি আর এই বাড়ির ওই চাকরই ছিল তোর সব। তোর বাবার কাছে যে স্নেহ তুই পাসনি, সেই স্নেহ পেয়েছিস ওই মানুষটার কাছে। ওর স্নেহ-ভালবাসা তোর দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিশে আছে।

বীরেন। আমি—

বিশাখা। ছোটবেলায় তোর একবার খুব অসুখ করেছিল, ডাক্তাররা আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তখন ওই বিশু পাঁচ মাইল পথ পায়ে হেঁটে জাগ্রত সিদ্ধেশ্বরী কালীমায়ের মাদুলী এনে তোর হাতে পরিয়ে দিয়েছিল। আর তাতেই তুই ভাল হয়ে উঠেছিলি। ওরে, ও আমাদের জন্য অনেক কিছুই করেছে, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছুই পায়নি।

বিশু। না-না, আমি কিছুই করতে পারিনি গিন্নিমা—আমি কিছুই করতে পারিনি।

বিশাখা। যা করেছিস, তার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না বিশু।

বীরেন। এই প্রশ্রয় দিয়েই তুমি ওকে মাথায় তুলেছ। ওর এতবড় সাহস—আমার মুখের ওপর কথা বলে, আমাকে শাসন করতে আসে!

বিশাখা। স্নেহ যেখানে বেশি, শাসনের অধিকার সেখানে আপনা হতেই জন্মায়। তোর কোন অন্যায় দেখে যদি তোকে শাসন করে থাকে, তাহলে আমি বলব—ও ঠিকই করেছে।

বীরেন। না, আমি কারও কোন শাসনের ধার ধারি না। আমি আমার ইচ্ছামত পথেই চলব, প্রয়োজন হলে—

বিশাখা। আমার গায়ে হাত তুলতেও তোর বিবেকে বাধবে না।

বীরেন। সবই যখন বুঝতে পারছো, আমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে এসো না। আর ওই বুড়ো ভামকেও বলে দাও—আমার কথার অবাধ্য হলে, আজ শুধু গায়ে হাত তুলেছি, এরপর আরও কঠিন শাস্তি দিতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।

[প্রস্থান।

বিশাখা। ওঃ ভগবান! যে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দীর্ঘ দুঃখের পাহাড় অতিক্রম করে এসেছি, সেই সন্তানও আজ আমার বুকে আঘাত দিতে চায়। যে হতভাগিনী স্বামীসুখ থেকে চিরবঞ্চিত, আজ তাকে তুমি পুত্রসুখ থেকেও বঞ্চিত করলে ঠাকুর! বলো ঠাকুর—বলো, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি? কেন তুমি আমার অদৃষ্টে দুঃখের লিপি লিখে দিলে? কেন—কেন—কেন? [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

বিশু। কাঁদবেন না গিন্নিমা.

গীতকণ্ঠে অভয়ের প্রবেশ।

অভয়।—

গীত

কেঁদে কেঁদে হলে সারা—
চোখের জলে বইবে বন্যা
ভাগ্যে যেটা আছে লেখা যাবে না তা মোছা।
তবে কেন কাঁদিস মিছে
ব্যথার পাহাড় বুকে ধরে,
এ পৃথিবীর হাসি-কান্নায় দুঃখ যে সব সার।

[প্রস্থান।

বিশু। গিন্নিমা—গিন্নিমা!

বিশাখা। বিশু! আমার এই দুঃখের রাত্রি শেষ হয়ে সুখের সূর্য কোনদিনই উঠবে না। আমার সব আশার সমাধি হয়ে গেল, আমার গর্ভজাত সন্তানের কাছে আমি হেরে গেলাম। বলতে পারিস, আমার এই পরাজিত মুখ আমি কোথায় লুকোব?

বিশু। শান্ত হোন গিন্নিমা, শান্ত হোন।

বিশাখা। এতদিন শান্ত হয়েই তো ছিলাম, কিন্তু বিনিময়ে কি পেলাম আমি! তুই তো জানিস, তোর কর্তাবাবু প্রতিদিন আমার ওপর কত নির্যাতন করেছে।

বিশু। হ্যাঁ, সেসব আমার চোখের সামনে এখনও ভেসে বেড়ায় গিন্নিমা। আমি আজও ভুলতে পারিনি, আপনার সেই রক্তমাখা মুখ-খানার ছবি। আপনি কর্তাবাবুকে পায়ে ধরে মদ খেতে বারণ করেছিলেন, তাতে কর্তাবাবু রেগে গিয়ে লাথি মেরে আপনাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আপনি টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়েছিলেন সিঁড়ির ওপর। আর তাতে কপাল কেটে সারা মুখখানা আপনার রক্তে ভেসে গিয়েছিল। ওঃ—সে কি নিদারুণ দৃশ্য!

বিশাখা। আমি কতবার মরতে গেছি, কিন্তু মরতে পারিনি ওই বীরুর জন্য। আমি যখন কাঁদতাম, বীরুও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদত। আমাকে বলত—মা, তুমি কেঁদো না মা, আমি বড় হলে তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। বাবা তোমার গায়ে হাত তুললে, আমি বাবাকে বাধা দেব। হারিয়ে গেল—সেই বীরুও আজ হারিয়ে গেল, ভুলে গেল তার অতীতের কথা।

বিশু। অদৃষ্ট গিন্নিমা, এসবই আপনার অদৃষ্ট।

বিশাখা। এই অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে আমার জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাতে হবে। বিশু, তুই তোর দেশের বাড়িতে ফিরে যা, আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে এখানে পড়ে থেকে কেন তুই লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করবি?

বিশু। না গিন্নিমা, আপনাকে আর মামণিকে ছেড়ে আমি এখান থেকে যাব না। খোকাবাবু আমার গায়ে হাত তুলেছে, তাতে আমি কিছু মনে করিনি। আমি এবাড়ির চাকর। চাকর অবাধ্য হলে

তাকে শাস্তি পেতেই হয়। আমিও তাই পেয়েছি, এতে আমার কোন দুঃখ নেই গিন্নিমা, আমার কোন দুঃখ নেই!

বিশাখা। বিশু—

বিশু। আপনাদের দুঃখের সমব্যথী হয়ে আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি আপনাদের পাশেই থাকব। আমি কোনদিনই পারব না আপনাদের দুঃখের সাগরে ফেলে রেখে চলে যেতে। কোনদিনই না—কোনদিনই না।

[অশ্রুভরা কণ্ঠে প্রস্থান।

বিশাখা। ভগবান, তোমার সৃষ্ট সকল মানবকে তুমি বিশুর মত সহজ সরল করে পৃথিবীতে পাঠিও। তাতে আর কিছু না হলেও, চরম দুঃখের দিনেও মানুষ অন্তত একটু আশার আলো দেখতে পাবে—আশার আলো দেখতে পাবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সতীনাথের বাড়ি

পলাশ ও গীতার প্রবেশ।

পলাশ। তাহলে গীতা, সত্যিই তুমি চাকরি করবে বলে মনস্থির করেছ ?

গীতা। হ্যাঁ, এছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই পলাশদা। ঘরে অসুস্থ দাদা, বৃদ্ধ বাবা, তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলাই তো আমার কর্তব্য।

পলাশ। তোমার এই মহৎ কর্তব্যে আমি বাধা দেব না গীতা। স্বার্থপরের মত চাইব না এখুনি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখতে। আমি তো জানি—তুমি আমারই, তবুও এই সংসারে তুমি কিছুদিন থেকে দুঃখের ভার যদি কিছুটা লাঘব করতে চাও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

গীতা। তুমি যে আপত্তি করবে না—এটা আমি ভাল করেই জানি।

পলাশ। আমার ওপর তোমার এতখানি বিশ্বাস!

গীতা। বিশ্বাস আছে বলেই তো দু'হাত ছেড়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছি।

পলাশ। সত্যি গীতা, এক এক সময় আমি ভাবি—

গীতা। কি ভাবো পলাশদা ?

পলাশ। অনেক কিছুই, যা মুখে বলা যায় না, শুধু অন্তরে উপলব্ধি করা যায়।

গীতা। তোমার এই স্বভাব এখনও গেল না। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলো, আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

পলাশ। এখনই সব না বোঝাই ভাল। বাপের বাড়িতে থেকেই যদি ভাবী স্বামীর সবকিছু জেনে যাও, তাহলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে জানার কোন কৌতূহলই তো থাকবে না। আর তা না থাকলে এই অধমের ওপর মন বসবেই বা কেন?

গীতা। বসবে মশাই, খুব বসবে।

পলাশ। কথা দিচ্ছ?

গীতা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। [সহসা পলাশকে প্রণাম করিল]

পলাশ। কি ব্যাপার গীতা, আজ হঠাৎ আমাকে প্রণাম করলে যে!

গীতা। ইচ্ছে গেল তাই করলাম।

পলাশ। তাহলে আমাকেও তো একটা আশীর্বাদ করতে হয়, কিন্তু কি আশীর্বাদ করি বল তো? [কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া] ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আশীর্বাদ করি—তুমি শতপুত্রের জননী হও। [আশীর্বাদের ভঙ্গিতে গীতার মাথায় হাত রাখিল]

গীতা। ধ্যেৎ! [লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢাকিল]

পলাশ। [গীতার হাত নামাইয়া] ভাবী স্বামীর কাছে এত লজ্জাটা কিসের?

গীতা। পলাশদা—[পলাশের বুকে মাথা রাখিল]

পলাশ। গীতা! এইভাবে—ঠিক এইভাবেই সারাজীবন তুমি আমার বুকে থাকবে।

গীতা। কিন্তু আমার যে সবসময়ই ভয় হয়।

পলাশ। ভয়! কিসের ভয়?

গীতা। তোমাকে হারাবার। কেন জানি না, আমার মনে বারবার শুধু একই প্রশ্ন জেগে ওঠে—এ হবার নয়, এ হতে পারে না।

পলাশ। গীতা!

গীতা। এমনও তো হতে পারে, তোমার অন্তর থেকে তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে!

পলাশ। না-না, আমার অন্তর থেকে আমি তোমাকে কোনদিনই দূরে সরিয়ে দিতে পারব না। ভালবাসার পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আমরা দুজনে কাছে এসেছি, উভয়ে উভয়কে চিনেছি, একে অপরের ব্যথার সমব্যথী হয়েছি। আজ যদি কোন কারণে আমাদের সেই ভালবাসার প্রদীপ নিভে যায়, তাহলে শুধু তোমার একার জীবনেই অন্ধকার নেমে আসবে না, আমার জীবনেও নেমে আসবে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। [প্রস্থানোদ্যত]

গীতা। পলাশদা!

পলাশ। পবিত্র প্রেমের মৃত্যু কোনদিনই হয় না গীতা। তুমিও দেখো, আমাদের ভালবাসার অপমৃত্যু কোনদিন হবে না, কোনদিনই না।

[প্রস্থান]

গীতা। ভগবান করুক, সত্যিই যেন আমরা কেউ কারও কাছ থেকে কোনদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ি। ভগবান! শত দুঃখের মধ্যেও তুমি আমার জন্য অন্তত একটু সুখ রেখো ঠাকুর, একটু সুখ রেখো।

শেখরের প্রবেশ।

শেখর। পলাশ কি চলে গেল রে গীতা?

গীতা। হ্যাঁ দাদা, এইমাত্র চলে গেল।

শেখর। জানিস, পলাশের সঙ্গে তোকে খুব সুন্দর মানাবে।

গীতা। দাদা!

শেখর। তা হ্যাঁ রে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে স্বামী-সংসার পেয়ে তোর এই দাদাকে ভুলে যাবি না তো?

গীতা। তাই কি কখনো পারি! কোন বোন তা পারে না দাদা, পারে না।

শেখর। জানিস—আমার কত সাধ ছিল তোর বিয়েতে আনন্দ উৎসব করব। এই বাড়িখানা আলোয় ঝলমল করবে, সানাই বাজবে, অনেক লোক নিমন্ত্রিত হবে—তারা তোকে আশীর্বাদ করবে। তাদের সেই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে স্বামীর হাত ধরে তুই নবজীবনের পথে পা বাড়াবি। কিন্তু হলো না রে, আমার সে সাধ স্বপ্ন বাস্তবের কঠিন আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

গীতা। দাদা!

শেখর। বাস্তব বড় নির্দয় রে, তাই সে আমার বুকে তুলে দিয়েছে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণায় আমি তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি।

গীতা। চুপ করো দাদা, চুপ করো। কেন তুমি নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছ?

শেখর। গীতা!

গীতা। আমি তো আছি দাদা। হলামই বা মেয়ে। প্রয়োজনেও কি পারব না সংসারের ভার কাঁধে তুলে নিতে?

শেখর। গীতা! তুই—

গীতা। আমি চাকরিটা নেব বলেই ঠিক করেছি, আজই তার কথাবার্তা ফাইনাল হবে।

শেখর। ওরে, তুই চাকরি করবি, আর তোর সেই চাকরির

পয়সায় আমি পেট পুরে খাব! না-না, তা হয় না—হতে পারে না। আমি তোকে চাকরি করতে যেতে দেব না।

গীতা। আমি পায়ে ধরে মিনতি করছি দাদা, তুমি আমায় বাধা দিও না। বাবার বয়স হয়েছে, এই বৃদ্ধ বয়সে বাবার মাথায় চিন্তার বোঝাটা অনেক ভারী হয়ে গেছে, তুমি আমাকে তার একটু ভাগ নিতে দাও।

শেখর। গীতা!

গীতা। তুমি মত দিলে বাবা কোন আপত্তি করবে না। আমি শুধু তোমার মতের অপেক্ষাতেই আছি।

শেখর। আমি—না-না, আমি তোকে বাধা দেব না। আ-আমি মতই দিলাম।

গীতা। দাদা!

শেখর। তুই চাকরি করবি, পয়সা এনে সংসারে দিবি। আর আমাদের কোন অভাব থাকবে না। জানিস গীতা, সত্যি সত্যিই তুই চাকরি করবি শুনে, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে রে! হাঃ-হাঃ-হাঃ—
[হাসিতে হাসিতে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

গীতা। দাদা! তুমি কাঁদছো?

শেখর। এঁ্যা—এই দেখ, কাঁদবো কেন রে! বোন চাকরি করবে, এই সুখবর শুনে কোন দাদা কি কাঁদে? না-না, আমি কাঁদিনি। কোন কাজ না করেই আমি বাড়িতে বসে বোনের উপায়ে ভালমন্দ খাব। হ্যাঁ রে, তুই যে বললি, আজই তোর চাকরির কথাবার্তা ফাইনাল হবে, তা তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, সময়মত না গেলে হয়তো চাকরিটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবে।

গীতা। দাদা!

শেখর। দাদা বলে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দেরী করিসনে, তাড়াতাড়ি যা।

গীতা। আমি তবে আসি দাদা।

[শেখরের পায়ের ধুলা লইয়া প্রস্থান।

শেখর। [গীতার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া] উপযুক্ত শিক্ষিত দাদা থাকতেও বোনকে যেতে হচ্ছে চাকরি করতে। ভগবান! তোমার সৃষ্ট এই জীবনটাকে তুমি আরও কত আঘাত দেবে? আর অত আঘাত আমি যে সহ্য করতে পারছি না ঠাকুর—সহ্য করতে পারছি না।

ফলের ঠোঙা হাতে সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। এত সহজেই আমাদের ধৈর্যের বাঁধটাকে আলগা করলে হবে না শেখর। গরীবদের যে সারা-জীবন কঠোর সংগ্রামের মুখো-মুখি দাঁড়াতে হবে, নইলে সবাই তলিয়ে যাবে অথৈ জলে।

শেখর। আজ তোমার কি হয়েছে বাবা? তুমি এভাবে কথা বলছ, তবে কি তোমার শরীর অসুস্থ?

সতীনাথ। না-না, আমি সুস্থ। তা হাঁ রে, গীতাকে যে দেখছি না! কোথায় গেল?

শেখর। সে একটু বাইরে গেছে, সন্ধ্যে নাগাদ ফিরবে।

সতীনাথ। তোকে বাড়িতে একা রেখে গীতা বাইরে গেল কি করে?

শেখর। তার কোন দোষ নেই বাবা, আমি তাকে যেতে বলেছি। আর তাছাড়া আগের থেকে আমি তো এখন একটু ভালই আছি।

সতীনাথ। হাঁ, তোকে ভাল হতে হবে। শেখর, তোকে ভাল

করার জন্য আমি অসাধ্য সাধন করব। এই নে, এই ফলগুলো রাখ্। [ফলের ঠোঙা দিল]

শেখর। এত ফল তুমি কোথায় পেলে বাবা?

সতীনাথ। আজ আমি নিজের উপার্জনের পয়সায় কিনে এনেছি। জানিস শেখর, অনেকদিন পরে আজ আমি বাপের কর্তব্য কিছুটা পালন করতে পেরেছি।

শেখর। তোমার নিজের উপার্জনের পয়সা। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না বাবা।

সতীনাথ। এই দেখ্, এই সহজ কথাটা আবার না বোঝার কি আছে! আমি আজ—

শেখর। না। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে কিছু একটা গোপন করতে চাইছো।

সতীনাথ। পাগল ছেলে, গোপন রাখব কেন? আমি তো বলছি—

শেখর। [সতীনাথকে ধরিয়া] না-না, গোপন করো না। আমাকে তুমি সব খুলে বলো।

সতীনাথ। তাহলে শোন্ বলছি। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস যাত্রীদের সঙ্গী হয়েছিলাম, যদি করুণা করে এই গরীব বৃদ্ধকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেয়।

শেখর। কি বলছো বাবা! তুমি চাকরির জন্য গিয়েছিলে?

সতীনাথ। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তোকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে হবে, গীতার ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে এসব ভাবনা তো আমাকেই ভাবতে হবে। আর সেইজন্যই—

শেখর। বাবা!

সতীনাথ। জানিস, আমি চাকরি করব শুনে অফিসার ভদ্রলোকরা

হাসাহাসি শুরু করে দিল। কোট-প্যান্ট-টাইপরা বাবুরা আমার মুখের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বুড়ো বয়সে ছেলে বোধহয় ভাত দেয়নি! একজন বললে, যান মশাই, আধুনিকা বৌমার পদসেবা করে দু'বেলা পেটের ভাত জুটিয়ে নিন। আর একজন তরুণ বললে, বৌমার পিছনে লাগলে, ছেলে মুখে লাথিই মারবে।

শেখর। [আহত কণ্ঠে] বাবা!

সতীনাথ। আমার তখন মনে হলো, ওদের কথার তীব্র প্রতিবাদ করি। চিৎকার করে বলি—না, আমার ছেলে সে ছেলে নয়। কিন্তু বলতে পারলাম না। কারণ আমার পিতৃত্বের অক্ষমতা আমার গলার টুঁটি চেপে ধরল। ওদের বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢেকে সেখান থেকে আমি সরে গেলাম।

শেখর। বাবা!

সতীনাথ। তারপর এখানে ওখানে কোন কাজের সন্ধান না পেয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে লাইন দিলাম। আমার দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রক্ত খুব সামান্যই ছিল। ব্লাড ব্যাঙ্ক সেই রক্ত নিয়ে আমার হাতে ধরিয়ে দিল [illegible]টি টাকা। আর সেই টাকা দিয়েই আমি তোর জন্য ফল কিনে এনেছি।

শেখর। কি বললে! তু-তুমি রক্ত বিক্রি করে আমার জন্য ফল কিনে এনেছ? আমার হাতে তোমার রক্ত! ওঃ ভগবান—[ফলের ঠোঙা পড়িয়া গেল]

সতীনাথ। ফলগুলো পড়ে গেল! দাঁড়া, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি। [ফল কুড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল]

শেখর। [বাধা দিয়া] না, ও ফল তুমি আমার হাতে দিও না বাবা, ফল আমি খেতে পারব না। ও ফল নয়, তোমার দেহের রক্ত।

আমি ছেলে হয়ে পারব না বাপের রক্ত খেতে। ওইতো—ওইতো আমি ফলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তোমার দেহের রক্তবিন্দু! ওই রক্তবিন্দুগুলো আমাকে দেখে বিদ্রূপ করছে। বলছে—শেখর, উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে হয়ে তুই বাপের রক্ত খাবি? [সহসা চিৎকার করিয়া] না—না, আমি পারব না—আমি পারব না তোমার রক্ত খেতে—আমি পারব না।

[হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

সতীনাথ। শেখর! শোন্। তাই তো, এখন আমি কি করব? এই ফলগুলো কি তবে জলে ফেলে দেব? না-না, আমার রক্ত বিক্রি করা পয়সায় ফল, আমার সন্তান নাই বা খেল, আমি নিজেই খেয়ে আমার নিজের রক্ত বৃদ্ধি করব। বাঃ-বাঃ, খুব মজা হবে, আমার রক্ত বিক্রি করা পয়সায় ফল আমি নিজেই খাব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[হাসিতে হাসিতে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

তারিণীর বাড়ি

কথা বলিতে বলিতে তারিণী ও নির্মলের প্রবেশ।

তারিণী। না-না, এসব করা তোমার ঠিক হচ্ছে না নির্মল।

নির্মল। কেন বাবা, আমি তো কোন অন্যায় কাজ করছি না।

তারিণী। ন্যায়-অন্যায় যদি বুঝতে, তাহলে তোমার জীবনের মহামূল্য সময় তুমি এইভাবে হেলায় নষ্ট করতে না।

নির্মল। না বাবা, জীবনের মূল্যবান একটুও সময় আমি হেলায় নষ্ট করছি না। বরং মহৎ কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে আমার এই জীবনটাকে খুব ধন্য বলে মনে হচ্ছে।

তারিণী। ও, তার মানে বলতে চাইছ, তুমি যেসব কাজ করছো, সেসব খুব ভালই কাজ।

নির্মল। হ্যাঁ বাবা। তোমার মত ক্ষুদ্র মন নিয়ে নিজের সুখ-ভোগকে বড় করে দেখার স্বপ্ন দেখাতে আমি শিখিনি। আর সেই-জন্যই চাই না তোমার ঐশ্বর্যের পাহাড়ে পরম নিশ্চিন্তে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুতে। আমি চাই সাধারণ মানুষের মত সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে বাঁচতে।

তারিণী। জীবন সম্পর্কে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই বলেই তুমি একথা বলছো। সাধ করে দুঃখকে বুকে তুলে নিলে তখনই বুঝতে পারবে, সেটা কতখানি যন্ত্রণাদায়ক।

নির্মল। আমার জন্য তুমি বৃথাই চিন্তা করছো বাবা। আদর্শ জীবন গড়তে হলে দুঃখকেও স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে হয়।

তারিণী। তুমি বুঝতে পারছো না তোমার জীবনের মূল্য কতখানি।

নির্মল। আমার একার জীবনই নয়, পৃথিবার প্রতিটি মানুষের জীবনই মূল্যবান। কিন্তু তাই বলে আমরা সকলেই যদি স্বার্থের যুপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিই, তাহলে যে পৃথিবী থেকে স্নেহ-মায়া-মমতা সব লোপ পেয়ে যাবে। জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষ বাঁচার প্রেরণা না পেলে তাদের জীবন যে মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

তারিণী। তাতে তোমার কি যায় আসে! তোমাকে আমি লেখা-পড়া শিখিয়ে উচ্চশিক্ষিত করেছি, তোমাকে নিয়ে আমার কত গর্ব। কিন্তু আজকাল যেসব কাজ করছ তা দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসছে।

নির্মল। তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো বাবা। দেখবে—যেটাকে তুমি ভুল ভাবছো, সেটা তোমার চোখের সামনে সুন্দর ফুল হয়ে ধরা দেবে।

তারিণী। ফুল! ভুলের পেছনে যখন মানুষ ছোটে তখন ফুল ভেবেই ছোটে। পরে ভুল বুঝতে পেরে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

নির্মল। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা হয় না বাবা। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এগুলে ভুলের সম্ভাবনা মোটেই থাকে না।

তারিণী। তাহলে তুমি বলতে চাইছো—যেসব কাজ করছ, সেসব ভুল কাজ নয়?

নির্মল। না। আচ্ছা বাবা, গ্রামে স্কুল হোক, ভাল রাস্তা হোক, সবদিক থেকে গ্রামের উন্নতি হোক—এটা কি তুমি চাও না?

তারিণী। না। গ্রামের উন্নতির জন্য আমি পয়সা খরচ করে তোমাকে লেখাপড়া শেখাইনি।

নির্মল। তাহলে কিসের জন্য আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছ বাবা?

তারিণী। সেটা কি তোমাকে বলে দিতে হবে, তুমি নিজে জান না?

নির্মল। তোমার সিন্দুকের টাকা বাড়াতে। কিন্তু আমার দ্বারা তুমি সে উপকার পাবে না। কারণ আমি কোনদিনই পারব না— আমার শিক্ষা-বিবেক-মনুষ্যত্বের গলা টিপে তোমার মিথ্যের পণ্য ফেরি করতে।

তারিণী। তার মানে, তুমি কি বলতে চাইছ?

নির্মল। বলতে চাইছি, শুধু সহজ সরল ছোট্ট একটি কথা। ছোট থেকে আমি দেখে আসছি, গরীব মানুষদের যে টাকা ধার দিয়েছ, সুদে-আসলে তার দশগুণ টাকা আদায় করেছ। কেউ দিতে না পারলে তাদের ঘর ভিটে পর্যন্ত আত্মসাৎ করেছ। আর তারা নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়ে সবকিছু তোমার হাতে সঁপে দিয়ে চোখের জলকে সাথী করে তোমার ত্রিসীমানা থেকে বহুদূরে সরে গেছে। কারণ তাদের ভয় আছে—সর্বস্ব গ্রাস করার পরেও হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমার ক্ষিদে তাদেরও গ্রাস করবে।

তারিণী। বাঃ—চমৎকার! এই না হলে আমার উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে!

নির্মল। উপযুক্ত শিক্ষিত ছেলে বলেই তো আমার গা থেকে ন্যায়ের চাদরখানাকে ফেলে তোমার গায়ের অন্যায়ের চাদরখানাকে আমার গায়ে জড়িয়ে গরীবের ঘরে আমি কান্নার বীজ বপন করতে পারিনি, আর পারবও না কোনদিন।

তারিণী। তোমাকে পারতেই হবে। আমি তোমার বাবা—গুরুজন, আমার আদেশ তোমাকে পালন করতে হবে।

নির্মল। তোমার অন্যায় আদেশ আমি পালন করতে পারব না। আমি পারব না—আমার মায়ের দেওয়া নির্মল নামটাকে কলুষিত করতে। আমার নামের উপযুক্ত কাজ আমাকে করতে দাও বাবা, আমাকে আমার পথেই চলতে দাও।

তারিণী। ডানা মেলে উড়তে শিখে এখন তুমি নিজেকে খুব বড় ভাবছো, তাই না? কিন্তু এটাও তুমি নিশ্চয়ই জান, পাখি ডানা মেলে যত উঁচুতেই উড়ুক না কেন, ক্লান্ত হলে তাকে আবার মাটিতে এসেই আশ্রয় নিতে হয়।

নির্মল। উপমাটা দেওয়া বোধহয় তোমার ঠিক হলো না বাবা। কারণ প্রয়োজনে তোমার আশ্রয় ছাড়তেও আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করব না।

তারিণী। তুমি—

নির্মল। আমি তোমাকে আগেও অনেক মিনতি করেছি, আবার আজও মিনতি করছি—তুমি তোমার পথ থেকে সরে এস বাবা। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আর মানুষ ঠকাবার কাজে নয়, মানুষকে ভালবাসার কাজে নিযুক্ত হও। তাতে তোমার জীবনে শান্তি আসবে। [প্রস্থানোদ্যত]

তারিণী। নির্মল!

নির্মল। তুমি ভাল হও বাবা, অন্ধকারের বুক চিরে নেমে আসুক আলোর রশ্মি। আর সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি তোমার পায়ে অর্পণ করে বলব—"পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম পিতাহি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা। [প্রস্থান।

তারিণী। হবে না, আমার আশা পূর্ণ হবে না। আমার একমাত্র ছেলে, তাকেও আমি আমার নিজের মত করে গড়তে পারলাম না। ভাগ্য—সবই আমার ভাগ্য!

[প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

ডাক্তারখানা

[বেদীর উপর একটি বাঁধানো ছবি। ফুলের মালা দিয়া সুন্দর ভাবে ছবিটি সাজানো। পাশে ধূপদানিতে ধূপ জ্বলিতেছে। একদিকে নবীন দাঁড়াইয়া জলভরা চোখে একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। অপরদিকে আলোক উদাসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দুইচোখে অশ্রু।]

আলোক। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল, তাই না নবীনকা?

নবীন। হ্যাঁ। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল, অথচ মনে হচ্ছে এই সেদিনের ঘটনা।

আলোক। ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যায়, সে সুখেরই হোক আর দুঃখেরই হোক। আজকে উনিশে আষাঢ়, আমার জীবনের এক শূন্য দিন, সব থেকেও সব হারাবার দিন।

নবীন। ওঃ, সে কি নিদারুণ দৃশ্য! কর্তাবাবুর মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল, আর অস্ফুট কণ্ঠে বারবার শুধু একটা

কথা বলতে লাগল—আলো, তুই এসেছিস বাবা! আয়—আমার কাছে বোস, আমার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দে।

আলোক। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] নবীনকা!

নবীন। আমি কর্তাবাবুকে বললাম, খোকার আজ আসার কথা নয়, কাল আসবে। কর্তাবাবু বললেন, না, আমার মন বলছে সে আজই আসবে। দেখ এতক্ষণে হয়তো আলো বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তুই যা, সদর দরজাটা খুলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

আলোক। চুপ করো নবীনকা, চুপ করো, আর বলো না।

নবীন। বলতে দাও খোকা, আজকের এই দিনে আমার বুকটাকে একটু হাল্কা করতে দাও। তারপর রাত্রি যত বাড়তে লাগল, কর্তাবাবুর যন্ত্রণাও ততই বাড়তে লাগল। শেষে কর্তাবাবু বললেন—নবীন, আলোর ফটোটা এনে দে। আমি তাই দিলাম। কর্তাবাবু বড় বড় চোখ বার করে তোমার ফটোটার দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজছিলেন। তারপর বললেন, জানিস, আমার আলো অন্ধকারের বুকে আলো দেখাবে। আমি চলে যাচ্ছি, তুই আলোর পাশে সব সময় থাকিস, তাকে বলিস—আমার মরার সময় হয়েছে, আমি মরছি, সে যেন আমার জন্য না কাঁদে।

আলোক। কান্না বুকে নিয়ে যে জন্মেছে, সে কি না কেঁদে থাকতে পারে! আমি হতভাগ্য, তাই বাবার রোগশয্যার পাশে থেকে সেবা করতে পারিনি। এ যে আমার কতখানি দুঃখ, সে আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।

নবীন। বুঝি, আমি সবই বুঝি খোকা। তোমার দুঃখ-ব্যথা-বেদনা আমার কাছে কিছুই অজানা নয়।

আলোক। হাঁা, আমার অতীতের এখন একমাত্র তুমিই তো নীরব

সাক্ষী। আচ্ছা বলতে পারো, এই মহৎ মানুষটা সেদিন যদি দয়া-পরবশ হয়ে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর বন থেকে আমাকে কুড়িয়ে এনে সমাজে প্রতিষ্ঠা না দিত, তাহলে কোথায় ভেসে যেতাম আমি!

নবীন। আবার ওইসব পুরোনো কথা তুলে তুমি মনকে কষ্ট দিচ্ছো! তোমাকে না কতবার বলেছি, ওইসব পুরোনো কথা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দাও!

আলোক। পারি না—আমি পারি না নবীনকা। সারাদিন রোগীদের নিয়ে কর্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখি। কিন্তু রাত্রি হলে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিই, সমস্ত জগৎ সংসার যখন নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে, সমস্ত মানুষ যখন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন আমার চোখে ঘুম আসে না। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় দু'চোখের জলে বুক ভাসাই। একটাই প্রশ্ন শুধু বারবার আমার মনে উঁকি মারে—কে আমার মা, কে আমার বাবা?

নবীন। খোকা!

আলোক। যে বাবা আমায় জন্ম দিলে, যে মা আমাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে এই পৃথিবীর আলো দেখালে, সেই বাবা-মাকে আমি চিনলাম না—জানলাম না!

নবীন। দুঃখ করো না খোকা। তোমার মা-বাবার স্নেহ পাওনি ঠিকই, কিন্তু কর্তাবাবু আর গিন্নিমা তো তোমাকে স্নেহ দিতে কার্পণ্য করেনি! তোমাকে তারা পুত্রস্নেহে মানুষ করেছে। এমনকি তোমাকে পেয়ে তারা নিজেদের সন্তান না থাকার দুঃখকেও ভুলেছিল।

আলোক। জানি, ছ'মাসের একটা অবাঞ্ছিত শিশু এখানে অগাধ স্নেহ না পেলে আজ এই শক্ত মাটির ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। বড় হয়ে যখন আমি একথা জানতে পারলাম,

তখন আমার জীবনের প্রতি খুবই ধিক্কার জন্মেছিল। মনে হয়েছিল, আত্মহত্যা করে আমার জন্মের কলঙ্ক থেকে আমি অব্যাহতি নিই। কিন্তু পারিনি—আমি পারিনি শুধু এই মানুষটার মহত্বের কথা ভেবে।

নবীন। তাই যদি হয়, তাহলে তোমার অতীতকে তুমি ভুলে যাও খোকা। মনে করো, তোমার জন্মটাই ছিল নেহাতই আকস্মিক।

আলোক। বাইরের আগুনকে যত সহজে নেভানো যায়, মনের আগুনকে তত সহজেই নেভানো যায় না নবীনকা। আমার চারপাশে সবুজ বনভূমি থাকা সত্বেও আমার মনে হয়—মরুভূমির তপ্ত বালুকার ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি, যে-কোন মুহূর্তে শেষ হয়ে যাব। কিছুতেই আমি ভুলতে পারি না, আমি অবৈধ সন্তান—অবৈধ সন্তান। [হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল]

নবীন। খোকা!

আলোক। জানি না কোন্ শয়তান আমাকে এনেছিল এই মাটির পৃথিবীতে। কিন্তু আমার গর্ভধারিণী যদি জন্ম-মুহূর্তেই আমার গলা টিপে শেষ করে দিত, তাহলে আমার অতীতকে ভেবে আজ আমায় চোখের জল ফেলতে হতো না।

[অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রস্থান।

নবীন। কর্তাবাবুকে আমি পই পই করে বারণ করেছিলাম, ওই ছোট্ট শিশুকে তার অতীত কথা কিছু শোনাতে হবে না। কিন্তু কর্তাবাবু শুনলেন না—সত্যকে প্রকাশ করে দিলেন। কিন্তু ছেলেটার চোখে জল দেখলে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। দেখি, কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটা কোথায় বেরিয়ে গেল। খোকা—খোকা—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীরেনের বাড়ি

লতা ও বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। তোর মনোভাব তোকে বদলাতে হবে লতা।

লতা। না: শেখরদাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় দাদা।

বীরেন। কেন সম্ভব নয় শুনি?

লতা। তুমি তো জান, শেখরদাকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালবাসি।

বীরেন। ও শুকনো ভালবাসায় পেট ভরে না, বুঝলি? পেট ভরাতে হলে চাই অর্থ। আর সেই অর্থ ই শেখরের নেই।

লতা। আমি সব জেনেশুনেই শেখরদাকে বিয়ে করতে চাই। কারণ—

বীরেন। কারণ?

লতা। অর্থে পেট ভরে, কিন্তু মন ভরে না। মন ভরাতে হলে চাই—

বীরেন। [বিদ্রূপের সুরে] শেখরের অফুরন্ত ভালবাসা, তাই না?

লতা। সবই যখন জান দাদা, তখন কেন তুমি আমাকে আঘাত দিতে চাইছো!

বীরেন। আঘাত এখনও তুই কিছুই পাসনি, তবে খুব শিগগীর তুই একটা বড় ধরণের আঘাত পাবি, আর তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকিস।

লতা। [ভয়ার্ত কণ্ঠে] দাদা!

বীরেন। আমি এখনও বলছি, যদি ভাল চাস তো রমেশকে বিয়ে কর্।

লতা। না, আমি পারব না একটা জানোয়ারকে আমার জীবন-সঙ্গী করতে।

বীরেন। জানোয়ার! আমার বন্ধু রমেশ জানোয়ার?

লতা। হ্যাঁ। শুধু ভদ্র পোশাক পরে মনুষ্য সমাজে ঘুরে বেড়ালেই তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না দাদা। তোমার বন্ধুর অতি জঘন্য ব্যবহার বনের জানোয়ারকেও হার মানায়।

বীরেন। তোর স্পর্ধা দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। রমেশ কত বড়লোকের ছেলে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে, সেটা হতো তোর সৌভাগ্য।

লতা। আমার দুর্ভাগ্য নিয়েই আমাকে থাকতে দাও দাদা। তোমার বন্ধুকে তুমি কতটুকু চিনেছ তা জানি না। তবে আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে যে ব্যবহার করেছে, তাকে আমি মানুষ বলে ভাবতেই পারি না।

বীরেন। ওর স্বভাবটাই ওইরকম। তাই বলে ছেলে হিসেবে সে মোটেই খারাপ নয়।

লতা। তাহলে খারাপ কাকে বলে দাদা?

বীরেন। আচ্ছা, বন্ধুর বোনের সঙ্গে একটু না হয় ঠাট্টা-তামাসা করেইছে। তাই বলে সে খারাপ হয়ে গেল! না-না, এটা আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই।

লতা। তোমাকে মানতে হবে না দাদা। তোমার চোখে সে খুব ভাল হয়েই থাক্। তবে তাকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কথা বলতেও আমি ঘৃণা করি।

বীরেন। এমনও তো হতে পারে, সেই ঘৃণার পাত্রর হাত ধরেই তোকে পথ চলতে হবে, তারই পদসেবা করে তোর জীবনটাকে ধন্য মনে করতে হবে!

লতা। সেরকম হলে আমি মরব দাদা, তবু—

বীরেন। শেখরকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবি না। [চিৎকারে] না, তা হবে না—হতে দেব না।

লতা। আমার ভবিষ্যত স্বপ্নকে তুমি ভেঙে চুরমার করে দিও না দাদা।

বীরেন। স্বপ্ন? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বীরেন চৌধুরী একটা ভিখারীর ছেলেকে কোনদিনই ভগ্নিপতি বলে স্বীকার করবে না।

লতা। ভিখারীর ছেলে হলেও সে আদর্শ মানুষ।

বীরেন। আ-দ-র্শ মানুষ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তা তুই কি আদর্শ বধূ হবার জন্যই শেখরের ঘরে যেতে চাইছিস?

লতা। হ্যাঁ, আমি আদর্শ বধূ হতে চাই।

বীরেন। আদর্শ বধূ হতে গিয়ে তোকে ভাঙা কুঁড়েঘরে আশ্রয় নিতে হবে।

লতা। সেটাই হবে আমার কাছে স্বর্গ।

বীরেন। কালবৈশাখীর ঝড় উঠলে তোর সেই স্বর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

লতা। আবার নতুন করে ঘর বাঁধব।

বীরেন। তারিণী চক্রবর্তীর কাছে শেখরের বাস্তুভিটে বন্ধক আছে, সে তাড়িয়ে দেবে।

লতা। তখন স্বামীর হাত ধরে গাছতলায় আশ্রয় নেব।

বীরেন। কিন্তু শেখরকে তুই স্বামীরূপে পাবি না! তোদের

মিলন-সেতু আমি ভেঙে চুরমার করে দেব। প্রয়োজন হলে তোদের দুজনের একজনকে আমি পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করব না।

লতা। [ভয়ার্ত কণ্ঠে] দাদা!

বীরেন। বুঝিয়ে দেব—আমিই এই বাড়ির সব। আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ হয় না—হবে না।

লতা। তুমি—

বীরেন। রমেশকেই তোকে বিয়ে করতে হবে। এই আমার শেষ কথা।

গরদের থান পরিহিত পূজার প্রসাদ হাতে বিশাখার প্রবেশ :

বিশাখা। শেষের পরেই আবার নতুন করে শুরু হয়। তাই আমি শুরু করছি, রমেশের সঙ্গে লতার বিয়ে হবে না।

বীরেন। তুমি—

বিশাখা। আমি মা। মেয়ের সুখের ঘর বেঁধে দেওয়া মায়েরই কর্তব্য। শেখরের সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব।

বীরেন। আদরের মেয়ের আর ভাবী জামাইয়ের মঙ্গল কামনায় বুঝি আজ পূজো দিতে গিয়েছিলে?

বিশাখা। হ্যাঁ, তাই গিয়েছিলাম।

বীরেন। আর সেই সঙ্গে তোমার এই কুলাঙ্গার ছেলের মৃত্যু কামনাও করেছ নিশ্চয়ই!

বিশাখা। সে আর পারলাম কই!

বীরেন। তা যে পারবে না আমি জানি। কারণ তোমার মৃত্যুর পরে এই কুলাঙ্গার ছেলেকেই যে মুখাগ্নি করতে হবে।

বিশাখা। [আর্তকণ্ঠে] বীরু !

বীরেন। ভয় নেই, আমার কর্তব্য নিশ্চয়ই আমি পালন করব, তোমার মুখাগ্নি করব আমি।

বিশাখা। তার প্রয়োজন হবে না। যে ছেলে মায়ের জীবতাবস্থায় এতটুকু কর্তব্যবোধ দেখায় না, সেই ছেলেকে মায়ের মৃত্যুর পরে তার শেষ কর্তব্যটুকু পালন করতে হবে না।

বীরেন। তাই কি কখনও হয়! তুমি যে আমার মা।

বিশাখা। তাই যদি ভাবিস, তাহলে কেন তুই আমার বুকে তুলে দিয়েছিস দুঃখের পাহাড়? কেন তুই ধরিয়েছিস আমার শান্তির ঘরে অশান্তির আগুন? কেন তুই আমার চোখের সামনে দিনের পর দিন নেমে যাচ্ছিস নরকের অতল অন্ধকারে? ওরে, অনেক আঘাত আমি সয়েছি, আর আমি সইতে পারছি না!

বীরেন। তুমি—

বিশাখা। [অশ্রুভরা কণ্ঠে] আমি মা হয়ে তোকে হাতে ধরে বলছি বীরু, তুই ভাল হ, আমার ছোটবেলার বীরু হয়ে সস্নেহে আমার গলা জড়িয়ে ধরে একবার 'মা' বলে ডাক্। [কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

বীরেন। বাঃ, তোমার তো অভিনয় করার ক্ষমতা যথেষ্টই আছে দেখছি।

বিশাখা। না রে না, এ আমার অভিনয় নয়। সন্তানের অধঃপতনে মায়ের বুকের ব্যথার প্রতিধ্বনি। আমার মত সকল মায়ের বুকেই এই ব্যথা বাজে।

বীরেন। থাক্ অনেক হয়েছে, আর শোনার ধৈর্য আমার নেই, আমাকে এখুনি বেরুতে হচ্ছে। তবে তার আগে তোমার শুরু করা কথাটা আমি শেষ করে দিয়ে যাই, মন দিয়ে শোন। লতার বিয়ে

শেখরের সঙ্গে হবে না, হবে আমার বন্ধু রমেশের সঙ্গে। কথাটা তুজনেই মনে রেখো।

[প্রস্থান।

লতা। কি হবে মা?

বিশাখা। ভয় নেই তোর, আমি আছি। শেখরের হাতেই তোকে আমি তুলে দেব।

লতা। কিন্তু দাদার কথা শুনে আমার যে ভীষণ ভয় করছে মা!

বিশাখা। ভয়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। একটা শয়তানের দাপটে এখনই যদি ভয়ে ভেঙে পড়িস, তাহলে যে সারাজীবন তোকে তু'চোখের জলে বুক ভাসাতে হবে।

লতা। মা!

বিশাখা। ভয়কে তু'হাতে দূরে সরিয়ে বুকে সাহস সঞ্চয় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়া। মনে রাখিস, অন্যায়ের পথকে গতিরুদ্ধ করে ন্যায়ের পথকে সুগম করতে হলে চাই সাহস।

[প্রস্থান।

লতা। মা ঠিকই বলেছে, আমার বুকে সাহস বাঁধতে হবে, নইলে আমি বাঁচতে পারব না।

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। কে বললে আমি বাঁচব না। ছোটবেলা থেকে তোমাকে আমি কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, আর তোমার বিয়ে না দেখে এত সহজেই আমি মরব? না, মরব না, তোমার বিয়ে না দেখা পর্যন্ত আমি মরব না।

লতা। বিশুকা।

বিশু। শেখর বাবাজীর সঙ্গে তোমাকে ভালই মানাবে মামণি। শেখর যেন এই মর্তের দেবতা আর তুমি দেবী। দেবতার পাশে দেবী না থাকলে কি মানায়!

লতা। কিন্তু বিশুকা—

বিশু। না-না, কোন কিন্তু নয়। শেখরের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। আমি সেদিন গিন্নিমাকে তোমাদের সব কথা বলেছি। তিনি খুব শীঘ্রই তোমাদের চার হাত এক করে দেবেন। গিন্নিমার মুখের কথা শুনে সেদিন থেকে আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারব না মামণি, কাউকে বলে বোঝাতে পারব না।

লতা। এত আনন্দ শেষপর্যন্ত থাকবে কি বিশুকা?

বিশু। থাকবে না মানে! নিশ্চয়ই থাকবে। গিন্নিমা যখন বলছেন— তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি মামণি, মনে মনে তোমাদের বিয়ে তো অনেক আগেই হয়ে গেছে।

লতা। সেইজন্যই তো আমার ভয়।

বিশু। না-না, তোমার কোন ভয় নেই মামণি, খুব শীঘ্রই এই বাড়িতে তোমার বিয়ের উৎসব হবে। কত লোক নিমন্ত্রিত হবে, তাদের সঙ্গে আমিও কত মণ্ডা-মেঠাই পেটপুরে খাব। এই দেখ, তোমার বিয়ের দিনে গিন্নিমার সঙ্গে আমাকেও যে উপোস করে থাকতে হবে।

লতা। তোমাকে উপোস করতে হবে?

বিশু। হ্যাঁ। গিন্নিমা তোমাকে সম্প্রদান করবেন, আর আমি বিয়ের পরে তোমাদের আশীর্বাদ করে তবেই জলস্পর্শ করব। আর আমি শুধু একাই তোমাকে আশীর্বাদ করব না মামণি, এই বাড়িতে

যত নিমন্ত্রিত লোক আসবে—তাদের সকলকে আদর-আপ্যায়ন করে হাতজোড় করে আমি বলব, আপনারা আমার মামণিকে আশীর্বাদ করুন। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমার মামণি নবজীবনের পথ চলতে শুরু করুক।

লতা। [অশ্রুভরা কণ্ঠে] বলো না বিশুকা, আর বলো না।

বিশু। না-না, কেঁদো না মামণি। এই আনন্দের কথা শুনে কেউ কি চোখের জল ফেলে? তুমি যে মেয়েছেলে, পরের ঘরে তোমাকে যেতেই হবে। আর তাছাড়া তোমার বিয়ে তো এই কাছেই হচ্ছে। আমি রোজ একবার করে গিয়ে তোমায় দেখে আসব।

লতা। বিশুকা—

বিশু। তুমি যে পেয়ারাগাছটা বসিয়েছ, তা থেকে রোজ দুটো করে পেয়ারা নিয়ে আমি তোমাকে দিয়ে আসব। তুমি যে পেয়ারা খেতে ভালবাস, সেটা আমি কোনদিন ভুলব না মামণি, কোনদিন ভুলব না।

[প্রস্থান]

লতা। বিশুকা আমাকে যতখানি ভালবাসে, আমার দাদা—যার সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ, সে আমাকে তার বিন্দুমাত্রও ভালবাসে না। অদৃষ্ট—সবই আমার অদৃষ্ট!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

নিশীথ ও ঝণ্টুর প্রবেশ :

নিশীথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এত সহজেই যে এত টাকা রোজগার করা যায়, এটা আমরা কোনদিন কল্পনাই করতে পারিনি।

ঝণ্টু। সত্যিই তাই। একটা দমকা ঝড়ে আমাদের জীবন কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। সোজা সরল পথ থেকে আমরা ছিটকে এসে পড়লাম এই বাঁকা চোরাপথে।

নিশীথ। জানিস ঝণ্টু! আজ যদি সেই কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা সেই আফসার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতো, তাকে বলতাম—যদি আপনার টাকার প্রয়োজন হয়, আপনি আমাদের কাছে হাত পেতে দাঁড়ান, আমরাই আপনাকে ভিক্ষা দেব।

ঝণ্টু। ভিক্ষা সে নেবে না রে নিশীথ, ভিক্ষা নিলে যে তার সম্মানে বাধবে। তাই সে আমাদের মত শিক্ষিত বেকারদের ঠকাবার কাজকেই বেছে নিয়েছে। শয়তানকে যদি একবার কাছে পেতাম, আমি তার টুঁটি চেপে ধরতাম। বুঝিয়ে দিতাম, চাকরির নাম করে টাকা আত্মসাৎ করার শাস্তি কত ভয়ঙ্কর!

নিশীথ। জীবনের চলার পথে একদিন না একদিন তার সঙ্গে দেখা আমাদের হবেই। আর সেদিন আমরা তাকে—

ঝণ্টু। খুন করে তার রক্তে আমাদের হাত রাঙিয়ে মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা তারস্বরে চিৎকার করে বলব—শয়তানের উপযুক্ত শাস্তি আমরা দিয়েছি।

নিশীথ। হ্যাঁ, তুই ঠিক বলেছিস ঝন্টু। এইটাই হবে তার অপরাধের চরম শাস্তি।

ঝন্টু। এই চরম শাস্তি তাকে না দেওয়া পর্যন্ত মনে শান্তি পাব না। জানিস নিশীথ, ওই শয়তানের জন্যই আমি বাবা-মায়ের সেবা করার অধিকারটুকু হারিয়েছি। এ যে আমার কতখানি লজ্জা—কতখানি দুঃখ তা আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারব না ভাই। [কণ্ঠরুদ্ধ হইল]

নিশীথ। ঝন্টু!

ঝন্টু। আমি কালও বাড়িতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে ছোট বোনটা আমার কাছে এসে বললে—দাদা, আমি দুদিন কিছু খাইনি, আমাকে কিছু খেতে দেবে? আমি ব্যাগ থেকে দু'খানা রুটি বার করে তার হাতে দিলাম। রুটি দু'খানা হাতে নিয়ে তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরম আগ্রহে সে যখন খেতে যাচ্ছে, সেই সময়ে মা এসে তার হাত থেকে রুটি কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, আর আমার ক্ষুধার্ত বোন সেই পড়ে থাকা রুটির দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

নিশীথ। আশ্চর্য! মা এমন পাষাণীও হয়, যে সন্তানের হাত থেকে ক্ষিধের খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়!

ঝন্টু। এ যে পাপের পয়সা। তাই তারা উপোস করে মরবে, তবু আমার পাপের পয়সার কোন জিনিস তারা হাত পেতে নেবে না। আজ আমার হাতে কত টাকা, অথচ আমার বাড়িতে চলছে নিরম্বু উপবাস। এ যে আমার কী কষ্ট—কী যন্ত্রণা—

নিশীথ। তোর পয়সা বাড়িতে নিচ্ছে না বলে তুই কষ্ট পাচ্ছিস, আর আমি বাড়িতে দিয়ে শেষ করতে পারছি না। যত দিচ্ছি, ততই

তাদের ক্ষিধে বাড়ছে। বাবা তো সেদিন মুখের ওপর বললে—খোকা, আমাদের মাসিক খরচের পরিমাণটা আরও কিছু বাড়িয়ে দিও। মা বললে, রোজ রোজ আর জল বইতে পারছি না। এবার বাড়িতে একটা কল না করলে আর নয়।

ঝণ্টু। তোর বাবা-মা খুব ভাল রে নিশীথ। আমার বাবা-মা যদি ওইরকম হতো, আজ আর আমার কোন দুঃখ থাকত না।

বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। দুঃখ মানুষের জীবনে চিরদিন থাকে না। গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসবেই। তবে বর্ষার কালো মেঘকে দেখে ভয় খেলে চলবে না, তাকে আলিঙ্গন করে নিতে হবে।

নিশীথ। বীরেনদা! তুমি হঠাৎ আমাদের কাছে?

বীরেন। কেন, আসতে নেই বুঝি?

নিশীথ। না—মানে তা বলছি না। তুমি তো আমাদের কাছে খুব একটা আস না। তাই বলছিলাম—

বীরেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি আসি না বলে আমার ওপর তোদের খুব অভিমান, তাই না? যাক আমি এসেছি, এখন মন থেকে সব অভিমান মুছে ফেল্। কি ব্যাপার ঝণ্টু, তুই চুপ করে আছিস, কোন কথা বলছিস না যে।

ঝণ্টু। [চমক ভাঙিল] এঁ্যা!

বীরেন। কি রে, এতক্ষণ কি চিন্তা করছিলি?

ঝণ্টু। না, মানে—

বীরেন। দেখ্, চিন্তা করা ভাল, তবে খুব বেশি চিন্তা করা মোটেই ভাল নয়, সেটা চলার পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নিশীথ। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ বীরেনদা।

বীরেন। আমি ঠিকই বলি রে! যাক শোন—এখন যে জন্য আমি তোদের কাছে এসেছি। আমার একটা কাজ তোদের করে দিতে হবে।

নিশীথ। নিশ্চয়ই করে দেব, বল্লো কি করতে হবে?

বীরেন। ধর্, কাজটা যদি কঠিন হয়?

নিশীথ। যত কঠিনই হোক, আমরা করে দেব।

বীরেন। কথা দিচ্ছিস?

নিশীথ। দিলাম।

বীরেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমি জানতাম, আমার কথা তোরা রাখবি। আর সেইজন্যই তোদের কাছে আসা। শোন, এক শয়তানকে তোদের খুন করতে হবে।

নিশীথ ও ঝণ্টু। খুন!

বীরেন। হ্যাঁ, শয়তান শেখর ঘোষাল আমার সুনামে কলঙ্কের কালি মাখাতে চায়, তাই তাকে আমি পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে চাই।

নিশীথ। খুন না করে প্রথমে একটু টাইট দিয়ে দেখলে কেমন হয়?

বীরেন। না, তাতে কোন ফল হবে না।

ঝণ্টু। কিন্তু—

বীরেন। না, কোন কিন্তু নয় ঝণ্টু। আমার এই কাজটা তোদের করতেই হবে। আর এর জন্যে আমি তোদের দশহাজার টাকা দেব।

নিশীথ। [বিস্ময়ে] দ-শ-হা-জা-র টাকা!

বীরেন। হ্যাঁ। [পকেট হইতে একবাণ্ডিল টাকা বাহির করিয়া]

নে, টাকাটা ধর্। তবে হ্যাঁ, কাজটা কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই হাঁসিল করা চাই। [নিশীথের হাতে টাকা দিল]

নিশীথ। তোমার কোন চিন্তা নেই বীরেনদা। টাকা যখন হাতে পেয়েছি, শেখর ঘোষালের লাশ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে খুব বেশি দেরী হবে না।

ঝণ্টু। কিন্তু নিশীথ! আমি বলছিলাম—

নিশীথ। আরে এতে আবার বলাবলির কি আছে? একসঙ্গে এতগুলো টাকা হাতছাড়া করা মূর্খামির কাজ হবে। জানিস, এই টাকায় অনেক দিন স্ফূর্তি করা যাবে। চল্ মালের দোকানে গিয়ে মনটা একটু চাঙ্গা করে আসি। আরে কাঠের পুতুলের মত এখনও দাঁড়িয়ে রইলি যে। আয়—আয়, একটু পেটে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[ঝণ্টুকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

বীরেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শেখর ঘোষালের লাশ নদীর জলে ভাসবে। তারপর গীতা। গীতাকে আমায় কাছে পেতেই হবে। কিন্তু গীতা যতদিন পলাশের প্রেমডোরে বন্দী থাকবে, ততদিন আমি শত চেষ্টা করলেও ওকে কাছে পাব না। তাই ওদের ভালবাসায় বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। পলাশের জীবন থেকে গীতাকে দূরে সরাতে হবে। [হঠাৎ দূরে লক্ষ্য পড়িতেই] ওই তো পলাশ এইদিকেই আসছে, এই সুযোগে গীতার বিরুদ্ধে পলাশের কান ভারী করে তুলতে হবে।

পলাশের প্রবেশ।

বীরেন। কেমন আছো পলাশ?

পলাশ। বীরেন! তুমি এখানে?

বীরেন। এই এদিকে একটু বেড়াতে এসেছিলাম। তারপর তুমি তো ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ। আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না। এখন নিশ্চয়ই শেখরদের বাড়ি থেকে ফিরছো ?

পলাশ। হ্যাঁ।

বীরেন। ঠিকই ধরেছি। যাক, বিয়ে কবে করছো বলো।

পলাশ। বিয়ে !

বীরেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ভেবেছো আমি কিছু জানি না। আমি সবই জানি। গীতার সঙ্গে তোমার বিয়ে তো ঠিক হয়েই আছে। কিন্তু পলাশ, যাকে তুমি জীবনসঙ্গিনী করবে, তার সবদিক তোমার খোঁজখবর নেওয়া উচিত। নইলে ভবিষ্যত দাম্পত্য-জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

পলাশ। হ্যাঁ, তবে আমি নিশ্চিত, গীতার মত মেয়ে আজকের দিনে সচরাচর দেখাই যায় না।

বীরেন। এটা তোমার অন্ধ ভালবাসা পলাশ। তুমি নিশ্চয়ই জান, গীতা এখন একটা চাকরি করছে।

পলাশ। হ্যাঁ, তার এই চাকরির ব্যাপারে আমি মত দিয়েছি।

বীরেন। কিন্তু কি চাকরি, তা তো তুমি জান না।

পলাশ। না। তবে আমার বিশ্বাস, গীতা কোন খারাপ কাজ করবে না।

বীরেন। তোমার বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটেছে পলাশ। তোমার ভাবী স্ত্রী গীতা এখন হোটেল গার্ল, তাকে পরপুরুষের মনোরঞ্জন করে পয়সা উপার্জন করতে হয়।

পলাশ। [চিৎকার করিয়া] না-না, এ আমি বিশ্বাস করি না।

বীরেন। আমার মুখের কথায় তোমায় বিশ্বাস করতে হবে না।

কলকাতার ষ্টার হোটেলে গেলেই দেখতে পাবে—যাকে নিয়ে তুমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছো, তোমার সেই স্বপ্নলোকের প্রিয়া পরপুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে—

পলাশ। চুপ করো—চুপ করো, আর বলো না।

বীরেন। তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে পলাশ। তোমার সহজ সরল প্রাণে আঘাত দেওয়া গীতার ঠিক হয়নি। সত্যি এ-যুগে ভালবাসার কোন মূল্য নেই—কোন মূল্য নেই।

[প্রস্থান।

পলাশ। গীতা হোটেল গার্ল, পরপুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে সে—না-না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু বীরেন যে বললে কলকাতা ষ্টার হোটেলে—না-না, আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি না—চিন্তা করতে পারছি না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্টার হোটেল

গীতার প্রবেশ।

গীতা। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! আমাকে দিয়ে দরখাস্তে সই করালে চাকরি দেবে বলে, কিন্তু আজ আমাকে এই হোটেলে গান গেয়ে লোকের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে। দাদার অসুখের জন্য আজ আমাকে হাসিমুখে সব সহ্য করতে হবে। পারব না বললে তো চলবে না!

মিঃ দেশাইয়ের প্রবেশ।

দেশাই। সাচ্ বাৎ বলছি গীতাজী। তোমাকে ছাড়া হামার জীবনটাও চলবে না।

গীতা। মিঃ দেশাই!

দেশাই। তুমার গান—তুমার হাসি—আউর তুমার এই খাপসুরৎ কাজলা আঁখি হামাকে পাগল করিয়েছে। তুমি বিশওয়াস কর, তুমাকে হামার জীবনের সাথে না পেলে হামি পাগল হয়ে যাবে।

গীতা। তা হয় না মিঃ দেশাই। বাড়িতে আমার অসুস্থ দাদা, আর তার চিকিৎসার জন্য আমি—

দেশাই। তার জন্য চিন্তার কি আছে গীতাজী। চলো হামরা দুজনে বেনারস চলে যাই। গঙ্গার ধারে আমার ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। সেখানে সংসার বসাবো, মাসে মাসে তুমি তোমার দাদাকে টাকা পাঠাবে।

গীতা। কিন্তু—

দেশাই। কোন কিন্টু নাই। বলো, কাল সবেরে হামার সাথে তুমি চলে যাবে? গীতাজী, হামি তোমাকে রাণী করিয়ে রাখবে। রাতের বেলায় তুমি গাইবে গজল ঠুংরী আর হামি তুমার গান শুনতে শুনতে বেহুঁশ হইয়ে যাবে।

গীতা। আমি পারব না শেঠজী, আমি যে একজনকে ভালবাসি।

দেশাই। গোলি মার দো মহব্বতকো। তুমি ভালবাস, লেকিন সে তুমাকে ভালবাসে না। তা যদি সাচ্চা হোত, তাহলে তুমাকে সে হোটেলমে নাচা-গানা করতে দিতো না। হামি জানে গীতাজী, তুমি শুধু নাচা আউর গানা করো, লেকিন ইজ্জত বিক্রি করো না।

গীতা। শেঠজী!

দেশাই। বোলো, তুমি যাবে? গীতাজী' ঠিক তুমার মত হামারভি এক বহিন ছিল। লেকিন এক হোলিয়া রাতমে গানা করতে করতে উ মরিয়ে গেলো। হামি তাই তুমার কাছে ভিক্ষা করছি, তুমি হামার বহিনের শোক হামাকে ভুলিয়ে দাও। মনে করো, হামি তুমার দাদা আউর তুমি হামার বহিন।

গীতা। কি বললে, দাদা?

দেশাই। হাঁ, হামি তুমার দাদা।

গীতা। তবে পায়ের ধুলো দাও দাদা, আর আশীর্বাদ করো, আমি যেন কোনদিন অসৎপথে না যাই। [পায়ের ধুলো লইল। দেশাই গীতার মাথায় চুমু দিল]

পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। বাঃ—চমৎকার! আমি শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। এখন নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস হলো।

গীতা। [সহসা ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিয়া] তুমি!

দেশাই। হাপনি কে মোশা, হামাদের কোথাবাত্তার মধ্যে ডিষ্টার্ব করতে এলেন!

পলাশ। না, ডিষ্টার্ব আমি করব না, এখনই চলে যাচ্ছি। শুধু দেখে গেলাম, যাকে আমি মুক্তো বলে মালা গেঁথে পরতে চেয়েছিলাম, সে মুক্তো নয়, মেকি ঝুটো কাঁচ। [প্রস্থানোদ্যত]

গীতা। পলাশদা—

পলাশ। ধিক্, ধিক্ গীতা। এখন তোমাকে আমার ঘৃণা হচ্ছে। ঘৃণা—শুধুই ঘৃণা।

[প্রস্থান।

গীতা। না, আমি আর পরছি না—পারছি না! [ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

দেশাই। হামি বুঝেছি বহিন—সব বুঝেছি। হামি কলকাত্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যাবার সোময় একটা কথা বলে যাচ্ছি—ভেঙে পড়লে চলবে না, শোক্ত হতে হোবে। মনে রাখতে হবে তুমি সীতা-সাবিত্রীর দেশের মেয়ে আছো, যাদের দেখলে মা বোলে পরণাম করতে ইচ্ছে হয়, বহিন বোলে প্যার করতে ইচ্ছে হয়। আদাব বহিন, আদাব।

[প্রস্থান।

গীতা। পলাশদা আমাকে ভুল বুঝে চলে গেল। এখন আমি কি করব? হ্যাঁ—যাব। পলাশদার ভুল ভাঙাতে আমাকে যেতেই হবে—যেতেই হবে।

[প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

পথ

ভদ্র পোশাকে বাজারের থলি হাতে সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। দীর্ঘদিন বিষন্নতার অন্ধকারে পড়ে থেকে এখন সূর্যের আলো বেশ কিছুটা উপভোগ করতে পারছি। শেখর ভাল হয়ে উঠেছে। এবার একটা চাকরি পেলেই গীতার বিয়ের ব্যবস্থা করব।

তারিণীর প্রবেশ।

তারিণী। মা কালী, সদয় হ মা! [সুরে] আমার সাধ না মিটিল আশা না ফুরাল বয়স তো বেড়েই যায় মা! আরে সতীনাথ যে! অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। বাজার করতে গিয়েছিলে বুঝি? হেঃ-হেঃ-হেঃ! পোশাকটা তো বেশ ভালই হয়েছে।

সতীনাথ। কি করি বলুন! গীতা জোর করে এসব কিনে দিলে। আমি তো পরতেই চাইনি, কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা। তাই—

তারিণী। এখন মেয়ে যখন চাকরি-বাকরি করছে, তখন নিশ্চয় ভালমন্দ খাবে বৈকি। আমার বাকি টাকাটা কি করলে সতীনাথ?

সতীনাথ। দেব—নিশ্চয়ই দেব। পাঁচশো টাকা যখন এর মধ্যে শোধ করেছি, বাকিটাও দিয়ে দেব। গীতা বলছিল, আর কিছুদিনের মধ্যেই—

তারিণী। দিয়ে দেবে, সেটা অবশ্য বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার তো বিবেক মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকা দরকার।

সতীনাথ। আছে। আমার বিবেক দিন-রাত কশাঘাত করে,

মনুষ্যত্ব আমাকে চোখ রাঙায়, অন্তরটা কেঁদে কেঁদে ওঠে। আমি এমনই অক্ষম বাপ যে, মেয়ের উপায়ে আমাকে বসে বসে খেতে হচ্ছে। এ যে আমার কতবড় লজ্জা—কতবড় ঘৃণা, তা কাউকে বলে বোঝানো যায় না। কিন্তু কি করব বলুন, এ সবই আমার অদৃষ্ট।

তারিণী। তা হয়তো ঠিক। যাক শোন ! তোমার সোমত্ত মেয়ের বাইরে বিদেশ বিভূঁইয়ে একা একা চাকরি করতে যাওয়া ভাল নয়। কারণ দিনকালের অবস্থা তো জান। তাই বলছিলাম, তোমার মেয়েকে চাকরি করতে আর পাঠিও না। কখন কি হয় বলা তো যায় না। হয়তো কোন বাজে ছেলেকে নিয়ে দেখবে কেটে পড়েছে।

সতীনাথ। চক্রবর্তী মশাই ! গীতা সে ধরণের মেয়ে নয়।

তারিণী। সবই ঠিক, তবে কথায় আছে—'নারীর যৌবন না মানে দিনক্ষণ'। গীতা যেখানে চাকরি করছে, সেখানে পুরুষও তো আছে, তাদের সঙ্গে একটু-আধটু ইয়ে—মানে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হতে হতে, শেষে দুটি হৃদয় এক হতেও তো পারে।

সতীনাথ। [রাগিয়া] চক্রবর্তী মশাই ! মুখ সামলে কথা বলুন। নইলে—

তারিণী। হেঃ-হেঃ-হেঃ ! আজকাল মেয়ের উপায়ে খেয়ে চোখ রাঙাতে খুব শিখেছ দেখছি। তবু যদি আমার কাছে দেনা না থাকত, তাহলে তো হাতে মাথা নিয়ে নিতে।

সতীনাথ। দেনা আছে বলে আপনি আমার মেয়ের সম্বন্ধে আমারই সামনে যা-তা কথা বলবেন, আর আমি তা সহ্য করব ! ওগো আমার নিষ্ঠুর জীবন দেবতা, সমস্ত আশার আলো—সমস্ত কামনা বাসনাকে ধুয়ে-মুছে এই হতভাগ্যের মৃত্যু দাও ঠাকুর, মৃত্যু দাও ! [কান্না নামিয়া আসিল]

তারিণী। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখের জল না ফেলে আমার টাকাটা তাড়াতাড়ি শোধ দেবার ব্যবস্থা কর। নইলে—

সতীনাথ। নইলে ?

তারিণী। যেখানে তোমাকে দেখতে পাব, সেখানেই তাগাদা করব। আর বলব, এই সেই ভদ্র পোশাকধারী জোচ্চোর, যে মেয়ের রোজগারে খায় আর পাওনাদারকে চোখ রাঙায়। কথাটা মনে থাকে যেন।

[প্রস্থান।

সতীনাথ। ওঃ ভগবান! আমার অদৃষ্টে তুমি কি লিখেছ? আমাকে যদি এ পৃথিবীতে পাঠালে, তবে কেন এ দুঃখের বোঝা দিয়ে পাঠালে? হয় আমাকে সুখের পথ দেখাও, নইলে এই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দাও—নিশ্চিহ্ন করে দাও!

[হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পলাশের বাড়ি

চিন্তান্বিত পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। পারছি না—আমি আর ভাবতে পারছি না। যত ভাবছি, ততই আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যে গীতাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসতাম, যার ছবি আমার মনের মণিকোঠায় সাজিয়ে রেখেছিলাম, সেই গীতা আজ আমার পবিত্র ভালবাসাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে—ওঃ, গীতা যে এত নীচ, এ আমি কোনদিন কল্পনাই করতে পারিনি। তার মেকি ভালবাসার কাছে আমার পবিত্র ভালবাসা আজ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

দ্রুত গীতার প্রবেশ।

গীতা। শান্তি আমিও পাচ্ছি না। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না পলাশদা।

পলাশ। আমার ভুল বোঝা না-বোঝায় তোমার কি যায় আসে। কেন—কেন তুমি এসেছ আমার কাছে? যাও, আমার চোখের সামনে থেকে তুমি সরে যাও।

গীতা। কি বলছো পলাশদা!

পলাশ। ঠিকই বলছি। তুমি ভেবেছিলে আমার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে যাবে। কিন্তু পাপ কোনদিন চাপা থাকে না। তাই তোমার আসল স্বরূপ আজ আমার চোখের সামনে ধরা পড়ে গেছে।

ছিঃ-ছিঃ, তুমি এত নীচ! তোমার সঙ্গে যে আমার সম্পর্ক ছিল, একথা ভাবতেও আজ আমার ঘৃণা হচ্ছে।

গীতা। [আহত কণ্ঠে] পলাশদা! তুমি—

পলাশ। জীবনের খেয়াটানে আমার জীবন-তরণী আমি তোমার কূলে বেঁধেছিলাম, আর এই অপরাধে আমার বুকে তুমি যে আগুন ধরিয়েছ, সেই আগুনে আমি জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। আ-আমি কি চেয়েছিলাম, আর কি পেলাম!

গীতা। পলাশদা! আমাকে তুমি বিশ্বাস করো—

পলাশ। বিশ্বাস? তোমার বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে আমার বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সেদিন তোমাকে হোটেলে আমি যে অবস্থায় দেখেছি, এর পরেও তোমাকে বিশ্বাস করার অর্থ মূর্খামির পরিচয় দেওয়া। না-না, আমি এতখানি মূর্খ নই যে, একটা দেহ-বিলাসিনীকে আমার ভালবাসার বাঁধনে বেঁধে রাখব।

গীতা। [অশ্রুভরা কণ্ঠে] কি বললে! আ-আমি দেহবিলাসিনী?

পলাশ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি দেহবিলাসিনী, তুমি ঘৃণ্যা, তুমি নরকের কীট!

গীতা। বলো না—বলো না, আমি সহ্য করতে পারছি না। [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

পলাশ। চোখের জল ফেলে আমার মন দুর্বল করতে পারবে না। তোমার মত মেয়েরা ঘৃণার পাত্র। হ্যাঁ-হ্যাঁ, শুধু ঘৃণারই পাত্র।

গীতা। [আর্তস্বরে] পলাশদা!

পলাশ। না, ও-নামে তুমি আমাকে কোনদিন ডাকবে না। আমার নাম ধরে ডাকার আজ আর তোমার কোন অধিকার নেই।

গীতা। অথচ এই অধিকার একদিন তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।

পলাশ। সেদিন তোমাকে না জেনে আমি ভুল করেছিলাম। আজ আমার চোখের সামনে থেকে সেই ভুলের পর্দা সরে গেছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ভালবাসা আমি অপাত্রে দান করেছি।

গীতা। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমার সব কথা আগে শোন।

পলাশ। না, আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। যে ভালবাসার বুকে তুমি কুঠারাঘাত করেছ, সেই আহত ভালবাসার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? তুমি কি ভেবেছ, নিজের সাফাই গেয়ে তোমার মেকি ভালাবাসাকে সত্যে পরিণত করবে? পারবে না—পারবে না। যাও—দূর হয়ে যাও তুমি আমার চোখের সামনে থেকে। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না—সহ্য করতে পারছি না!

গীতা। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো?

পলাশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি তোমাকে তাড়িয়েই দিচ্ছি। যে বাড়িতে লক্ষ্মীপুজা হয়, যে বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলে, সেই বাড়িতে তোমার মত নষ্টা মেয়ের স্থান হয় না। তোমার স্থান পচা নর্দমার পাশে অন্ধকার গলি, আর সেটাই হবে তোমার কাছে সুখের রাজত্ব।

গীতা। বলো, আরও কিছু বলো। আমি তো শুধু আঘাত নিতেই এই পৃথিবীতে জন্মেছি।

পলাশ। তুমি—

গীতা। না-না, আমি তোমায় কোন দোষ দিচ্ছি না, এ সবই আমার অদৃষ্ট। তোমার দেওয়া আঘাত বুকে নিয়ে আমি নীরবে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আর কোনদিন তোমার সামনে এসে আমার

এই মুখ দেখাব না। তোমার পায়ে হাত দেবার অধিকার আজ আমার নেই, তাই দূর থেকেই তোমাকে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি। [দূর হইতে প্রণাম করিল] পার তো তুমি আমাকে অভিশাপ দাও, আমি যেন তাড়াতাড়ি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি।

পলাশ। আমি—

গীতা। এই হতভাগিনীকে তুমি ভুলে যেও। মন থেকে মুছে ফেল আমার সমস্ত স্মৃতি। আজ আমার সম্পর্কে তোমার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, সেটা যেন চিরদিন তোমার কাছে সত্যি হয়েই থাকে। তাহলে খুব সহজেই তুমি আমাকে ভুলতে পারবে।

পলাশ। তুমি—

গীতা। তোমার শরীরের প্রতি লক্ষ্য রেখো। অযথা আমার কথা ভেবে চোখের জল ফেলে নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ো না। তাহলে আমি খুব কষ্ট পাব। তুমি আমার কাছে অনেক বড়, চিরদিন বড় হয়েই থাকবে। বিয়ে করে সংসারী হয়ো। যদি কোন বৃষ্টিঝরা রাতে ঘুম ভেঙে হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ে যায়, মনে করো আমি নষ্টা—আমি দেহবিলাসিনী—আমি ঘৃণ্যা!

[হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

পলাশ। ভেঙে গেল, আমার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আমার হৃদয় আকাশের রামধনুর মত রঙ যে এত তাড়াতাড়ি মুছে যাবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু কেন—কেন এমন হলো? আহত প্রেম মানুষকে কাঁদায়, আমাকেও সারাজীবন কাঁদতে হবে। চোখের জলই হবে আমার মহাভুলের মহাসংশোধন। [প্রস্থান।

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীর

হাসিতে হাসিতে শেখর ও লতার প্রবেশ।

শেখর। জান লতা, আমি যে সুস্থ হয়ে উঠব, তোমার সঙ্গে এই নির্জন নদীতীরে এসে কথা বলব, এ আমি ভাবতেও পারিনি।

লতা। তুমি কি ভাবতে পেরেছিলে যে, আমি তোমার সুস্থতার জন্য ঠাকুরের কাছে কত মানত করেছি—ঠাকুরকে কত ডেকেছি।

শেখর। আমি জানি সেকথা। আর এই এক হতভাগিনী গীতা, আমার জন্য আজ তাকে চাকরি করতে হচ্ছে।

লতা। সত্যিই গীতা নারীসমাজের গর্ব। গীতার মত মেয়ে এযুগে বিরল।

শেখর। আর তুমি? [হাত ধরিয়া] তোমার মত মেয়েও খুব কম পুরুষের জীবনে আসে। জান লতা, যখন রোগশয্যায় পড়ে থাকতাম, মনে হতো এ জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই তো সব সময় মৃত্যুর পথ চেয়ে বসে কত বিনিদ্র রজনী গভীর দুঃখ আর বেদনাকে আঁকড়ে ধরে কেটেছে। কিন্তু আজ তোমাকে কাছে পেয়ে আবার বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঠিক এইভাবে তুমি সারা-জীবন আমার পাশে থাকবে। [কাঁধে হাত দিয়া কাছে টানিল]

লতা। তাই নাকি মশাই! তাহলে আর একজনের কথাও চিন্তা

কর—যে তোমাকে স্বামীরূপে পাবার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তোমার জন্য দাদাকে যে উপেক্ষা করে এসেছে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছে—তোমার জন্যই সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকবে।

শেখর। আমি জানি লতা, মনের মধ্যে তিল তিল কামনা-বাসনা প্রেম-ভালবাসা জমিয়ে রেখে সুখ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছো, তবু আমার ভালবাসাকে তুমি উপেক্ষা করোনি।

লতা। শেখরদা! দাম্পত্য জীবনে সুখ ঐশ্বর্য মমতা ও কর্তব্যবোধ সব কিছুই পাওয়া যায়, কিন্তু ভালবাসা অন্য জিনিস। অনেক হাসি-কান্নার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে ভালবাসার পাত্র-পাত্রী।

শেখর। লতা—[মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল]

লতা। আমার দিকে অমন করে কি দেখছ?

শেখর। দেখছি তোমাকে। ভাবছি কবে আসবে সেদিন, যেদিন লাল বেনারসী পরে ঘোমটা টেনে ফুলের বিছানায় তুমি আমার পাশে এসে বসবে। আমি তোমায় দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলবো, কি, কেমন লাগছে এই নতুন ঘর—নতুন সংসার?

লতা। এই দুষ্টু, এখন ছাড়, কেউ দেখে ফেলবে। আমার ভারী লজ্জা করে।

শেখর। তারপর সমস্ত লজ্জা মুছে গল্প করতে করতে রাত্রি কেটে যাবে—আসবে দিন। বিকেলে নদীর তীরে গল্প করব। তোমার পাশে বসে দেখব নদীর জলে কেমন করে পানকৌটি ডুব দিচ্ছে—ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকারা নীল মেঘের নিচে ঢেউ তুলে সুন্দরভাবে চলে যাচ্ছে আপন ঠিকানায়। সন্ধ্যা আসবে নেমে, আমরা ঘরে ফিরব।

লতা। আমি সন্ধ্যা-প্রদীপ নিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেব, গলায় আঁচল দিয়ে তোমাকে প্রণাম করব—তুমি আশীর্বাদ করবে।

শেখর। কি আশীর্বাদ? শতপুত্রের জননী হও?

লতা। যাও—ওটা যেন কেমন ইয়ে।

শেখর। ইয়ে মানে! ও, তাহলে তুমি মা হতে চাও না? বেশ, মা হয়ো না—আমি চাই না বাবা হতে।

লতা। এই, কোন্ মেয়ে আবার মা হতে চায় না বল তো? সবাই চায় ছোট্ট ফুটফুটে সন্তান। গুটি গুটি হাঁটবে, এক হাত বাড়িয়ে দেবে মায়ের দিকে, আর এক হাত— .

শেখর। বাবার দিকে। বেশ তা না হয় হলো। [হাত ধরিয়া টানিয়া] এখন কাছে এস। এস—

লতা। বল কি বলবে। আঃ—বল না! ছেলেমেয়েরা উঠে পড়বে। সংসারে কাজ আছে।

শেখর। ও, সংসারে কাজই তোমার কাছে বড় আর আমি বোধহয়—[বুকে টানিয়া চুমু দিতে উদ্যত হইল]

লতা। [সরিয়া গিয়া]

গীত

না—না—না, বলো না,
এমন কথাটি মুখে বলো না।
আসেনি হৃদয়ে আজি প্রদীপ জ্বালার,
লগ্ন আসেনি এখন মালাটি দেবার;
বিজয়ীর মত তুমি আসবে যখন—
আমার আপন করে পাইবে তখন,
করিব না সেদিন আমি আর ছলনা।

শেখর। [হাত ধরিয়া] চলো লতা, অনেক দেরী হয়ে গেল। বাবা হয়তো খুব চিন্তা করবে। [প্রস্থানোদ্যত]

মুখে কাগড় ঢাকিয়া ছুরিহাতে নিশীথ ও ঝন্টুর প্রবেশ।

শেখর। একি, কারা তোমরা? কি চাও?

নিশীথ। চাই তোমার মৃত্যু। [শেখরের দিকে অগ্রসর]

লতা। না, শেখরদাকে মেরো না। কে আছ—বাঁচাও!

ঝণ্টু। চুপ—

[নিশীথ পিছন হইতে শেখরকে জাপটাইয়া ধরিল, ঝণ্টু ছুরি মারিতে যাইতেই শেখর তাহাকে সজোরে লাথি মারিল, ঝণ্টু পড়িয়া গিয়া ত্রস্তে উঠিয়া শেখরের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল]

শেখর। আঃ—লতা! পালাও—তুমি পালাও।

লতা। শেখরদা—শেখরদা—[কাছে যাইতে উদ্যতা হইল]

নিশীথ। যা, সরে যা এখান থেকে। [লতাকে ঠেলিয়া দিতেই সে পড়িয়া গেল]

ঝণ্টু। শালা এখনই মরে যাবে। ঝোপের আড়াল থেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। চল্—

[শেখরকে তুলিয়া লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

লতা। [উঠিয়া] শেখরদা—শেখরদা! [কাঁদিতে লাগিল]

সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। কে শেখর-শেখর বলে ডাকলে? ও, তুমি!

লতা। হ্যাঁ কাকাবাবু!

সতীনাথ। এখানে রক্ত কোথা থেকে এল? কার রক্ত? শেখর কোথায়?

লতা। কাকাবাবু! আমরা দুজনে বেড়াতে এসেছিলাম। এমন সময় দুজন গুণ্ডা এসে শেখরদাকে ছুরি মেরে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে চলে গেল।

সতীনাথ। হায় ভগবান! আমার অদৃষ্টে তুমি কি লিখেছ? আমি কি পাপ করেছি? কেন আমার এ শাস্তি? মৃত্যু দাও হে জগদীশ্বর, তুমি আমার মৃত্যু দাও!

লতা। শান্ত হোন কাকাবাবু, শান্ত হোন। চলুন—

সতীনাথ। কোথায় যাব? শেখর ছাড়া আমার কাছে যে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার। ওই তো—ওই তো শেখর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দাঁড়া বাবা—দাঁড়া, আমি যাচ্ছি—আমি তোর কাছে যাচ্ছি। [যাইতে গিয়া পড়িয়া গেল]

লতা। কাকাবাবু, উঠুন কাকাবাবু! [ধরিয়া তুলিল]

সতীনাথ। [উঠিয়া উদাস দৃষ্টিতে কি যেন দেখিতে লাগিল] কে? ও, তুমি যমরাজ? আমায় নিতে এসেছ? না, আমি তো যাব না, আমায় যে ছেলের মুখাগ্নি করতে হবে। কি বললে? আমি পারব না? দেখ না—একটু দাঁড়িয়ে দেখ, আমি কেমন হাসতে হাসতে মুখাগ্নি করি। দেখবে—দেখবে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[হাহাকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

লতা। কাকাবাবু—কাকাবাবু—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তারখানা

কথা বলিতে বলিতে আলোক ও নির্মলের প্রবেশ।

আলোক। সত্যিই আপনি জীবনের মধ্যে জীবন খুঁজে পেয়েছেন।

নির্মল। তাই বুঝি?

আলোক। হ্যাঁ, গ্রামের উন্নতির জন্য আপনি নিজেকে নিয়োজিত করছেন। সমগ্র গ্রামটাকে নিজের সংসার ভেবে তাদের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন।

নির্মল। এটা কিন্তু শুধু আমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, আপনার ক্ষেত্রেও। আপনিও দিন-রাত স্নান-খাওয়া ছেড়ে রোগীর চিকিৎসা করে চলেছেন।

আলোক। তা হলেও সেটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। আমি যদি আপনার সঙ্গে কিছু কাজ করতে পারতাম—

নির্মল। আমার সঙ্গে?

আলোক। হ্যাঁ, আমার অবসর সময়ে আমি যদি আপনার সঙ্গে গ্রামের কাজ করি, আপনার কোন আপত্তি আছে?

নির্মল। আপত্তি? কি বলছেন আপনি? আপনাকে পেলে কাজে আরও দ্বিগুণ উৎসাহ পাব আমি। কিন্তু—

আলোক। কোন কিন্তু নয়। আমি আজ থেকেই আপনার সঙ্গী হলাম।

নির্মল। সত্যিই আপনি শিবপুর গ্রামে ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

আলোক। আশীর্বাদই বলুন আর অভিশাপই বলুন, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে কাজ করবই, কোন বাধা শুনব না।

নির্মল। শুনবেন কেন! প্রকৃত কর্মীকে বাধার প্রাচীর দিয়ে কোন-দিনই আটকে রাখা যাবে না।

আলোক। তাহলে বলুন, এখন আমাকে কি কাজ করতে হবে।

নির্মল। রাত্রে ক্লাবে আসুন, ওইখানেই সবাই বসে আলোচনা করে কাজ ঠিক করা হবে।

আলোক। ঠিক আছে। কবে আদ্য স্কুলের উদ্বোধন করবেন ঠিক করেছেন?

নির্মল। ভাবছি পাঁচই মাঘ। কাল বি-ডি-ও'র কাছে যাব, উনি আবার ওইদিন আসতে পারবেন কিনা দেখি।

আলোক। আমিও যাব আপনার সঙ্গে বি-ডি-ওকে বিশেষ অনুরোধ জানাতে।

নির্মল। বেশ। জানেন, আজ কিন্তু আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

আলোক। কেন বলুন তো?

নির্মল। সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে যারা বখাটে ছেলে বলে পরিচিত, সেই ছেলেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনি যে কাজ করবেন—এই ভেবে সত্যিই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

আলোক। একটা কথা কি জানেন? সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা কোন ভাল কাজ তো করবেই না, উপরন্তু কাউকে করতেও দেবে না।

নির্মল। এ ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই গ্রামে এখনও কিছু ছেলে আছে, যারা অভিভাবকের কঠোর অনুশাসনে ভীত। তারা পারছে না ভয়ের খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে। তবে

আমার মনে হয়, এবার আপনাকে দেখে তারা বুকে সাহস বেঁধে এগিয়ে আসবে, যোগ দেবে আমাদের কাজে।

আলোক। তাহলে তো আমাদের কাজ অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

নির্মল। এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের হবেই। শত সহস্র ঝড়-ঝঞ্ঝা অগ্রাহ্য করে আমরা এগিয়ে যাব, লোভের ফাঁদে পা দিয়ে আমরা বিসর্জন দেব না আমাদের নৈতিক চরিত্র। জমাট অন্ধকার স্তম্ভে যে আলো আনার ব্রত গ্রহণ করেছি, সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে যদি মৃত্যুও আসে—হাসিমুখে বরণ করে নেব, তবু স্বর্গের সুষমা ঝরাতে জীবনের ভয়ে পিছিয়ে আসব না—কোনদিনই না।

[প্রস্থান।

আলোক। এই দেশে এখনও অনেক সুসন্তান আছে, যারা কর্তব্যের আহ্বানে লোভ-লালসার বাঁধন ছিন্ন করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে নবীনের প্রবেশ।

নবীন। ওঃ—এ আমি কি করলাম! এ আমার কি সর্বনাশ হলো! ও-হো-হো—[অঝোরে কাঁদিতে লাগিল]

আলোক। কি হয়েছে নবীনকা! তুমি কাঁদছো কেন?

নবীন। সর্বনাশ হয়েছে খোকা, আমার চরম সর্বনাশ হয়েছে। সারাজীবন যাকে আমি মাথায় তুলে রেখেছি, আজ নিজের দোষে তাকে কিনা আমি—ওঃ, এ মহাপাপ আমি কোথায় রাখব?

আলোক। মহাপাপ!

নবীন। হ্যাঁ খোকা। শেষ বয়সে ভগবান আমার অদৃষ্টে এই

লিখে রেখেছিল ! আমাকে মহাপাপ কুড়োতে হলো ? এর চেয়ে যদি আমার মৃত্যু হতো—

আলোক। অধৈর্য হয়ো না নবীনকা। কি হয়েছে আমাকে সব খুলে বলো।

নবীন। আমার যে আর বলার কিছুই নেই। তুমি তো জানো, রামায়ণকে আমি দেবতাজ্ঞানে পূজো করি। আজ সেই রামায়ণকে আমি বাসী কাপড়ে ছুঁয়ে তার পবিত্রতা নষ্ট করে দিয়েছি। আমি মহাপাপ করেছি খোকা, মহাপাপ করেছি।

আলোক। ও, তার জন্য তুমি এত চোখের জল ফেলছো ?

নবীন। ফেলব না ! চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিলেও যে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

আলোক। ওই চোখের জলেই তোমার সব পাপ ধুয়ে-মুছে গেছে নবীনকা। তাছাড়া তুমি তো জেনেশুনে একাজ করোনি। তবুও তার জন্য যে অনুশোচনার আগুনে পুড়ে মরছো, তাতেই তুমি সব পাপের বাঁধন ছিন্ন করতে পেরেছ।

নবীন। তুমি ঠিক বলছো খোকা ?

আলোক। হাঁা, অনুশোচনাই তো ভুলের চরম শাস্তি।

নবীন। তুমি যেসব বড় বড় বই পড়েছ, তাতে বুঝি এইসব কথা লেখা আছে ?

আলোক। কেন, আমার মুখের কথায় বুঝি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ?

নবীন। না-না, তোমার কথাকে অবিশ্বাস করব, এ দুর্মতি যেন আমার কোনদিন না হয়। আসলে আমার সব সময়ই একটা কথা মনে হচ্ছে—

আলোক। না, এখন থেকে তুমি আর কিছু মনে করবে না। চলো তোমাকে রামায়ণ পড়ে শোনাব।

নবীন। এসো, আমি কাপড় ছেড়ে ধূপ-দীপ জেলে রামায়ণ নিয়ে বসছি। বাল্মিকীর তপোবনে সীতার দুঃখের কাহিনীটা পড়ে আজ আমাকে শোনাবে। সত্যি, সীতার দুঃখে চোখ ফেটে জল এসে যায়— জল এসে যায়!

[প্রস্থান।

আলোক। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজের একশ্রেণীর মানুষ রামায়ণ-মহাভারতকে নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। প্রগতির পাখনায় ভর দিয়ে তারা মহাশূন্যে উড়তে চাইছে। কিন্তু না তা পারবে না। সত্যকে অস্বীকার করে মিথ্যাকে বুকে আঁকড়ে ধরে কেউ কোনদিন বড় হতে পারবে না। এই মূর্খ মানুষটার কাছে আজকের সবজান্তা আত্ম-অহঙ্কারীদের অনেক কিছু শেখার আছে—জানার আছে, যা দেখে তারা সত্যকে পূজো করতে শিখবে, সত্যের মর্যাদা দিতে জানবে।

[প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

বীরেনের বাড়ি

বিশাখা ও বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। আমি জানতে চাই, সিন্দুকের চাবি তুমি দেবে কি না?

বিশাখা। বলছি তো দেব না—দেব না—দেব না।

বীরেন। তাহলে তুমি আমাকে মোটেই চেন না।

বিশাখা। তোকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। জানি তুই একটা পাকা শয়তান।

বীরেন। সবই যখন জান, তখন স্বেচ্ছায় চাবিটা আমার হাতে তুলে দাও।

বিশাখা। না, এ চাবি আমি কিছুতেই দেব না। [আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা হাতে দিয়া চাপিয়া ধরিল]

বীরেন। তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে বলপ্রয়োগ করতে হচ্ছে। দাও—দাও বলছি! [জোরপূর্বক চাবি লইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বিশাখাকে সজোরে ধাক্কা দিতেই সে পড়িয়া গেল ও সেই সুযোগে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইল] দেবে না? হাঃ-হাঃ-হাঃ! [চাবির গোছা সামনে তুলিয়া ধরিয়া] বন্ধু! তুমি আমায় ঠিক ধরা দিয়েছ। [চুমু খাইল] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিশাখা। [উঠিয়া] শান্তি পেয়েছিস—শান্তি পেয়েছিস? ওরে, তুই আমার উপযুক্ত ছেলে, তাই দেহের রক্ত ঝরিয়ে মাতৃঋণ শোধ করলি! [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

বীরেন। কাঁদো, যত পারো চোখের জল ফেল, যত খুশি

আমাকে অভিশাপ দাও। তোমার অভিশাপে আমার কিছুই হবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

বিশাখা। না, কাঁদব না—আর আমি কাঁদব না, এবার শুধু হাসব—প্রাণ খুলে হাসব! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ডাকিতে ডাকিতে লতার প্রবেশ।

লতা। মা—মা! কি হয়েছে মা? তুমি এমন করে হাসছো কেন?

বিশাখা। আনন্দে—আমি আনন্দে হাসছি। আজ আমার মহা-আনন্দের দিন! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

লতা। বলো মা, কি হয়েছে? দাদাকেও হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে দেখলাম কেন?

বিশাখা। তোর দাদা আজ আমাকে অলঙ্কার দিয়েছে রে! [কপালে ক্ষতস্থান দেখাইয়া] এই দেখ্, সেই অলঙ্কার পরে আমি কেমন সুন্দর সেজেছি!

লতা। একি, রক্ত! দাদা শেষ পর্যন্ত তোমার গায়ে হাত তুললে মা?

বিশাখা। চুপ কর্—চুপ কর্। বাতাস শুনতে পেলে এখুনি একথা জগতের সব মায়েদের কানে পৌঁছে দেবে। তাহলে আর কোন মা তার সন্তানকে বুকের রক্ত খাইয়ে মানুষ করতে চাইবে না।

লতা। মা! তুমি—[কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

বিশাখা। কাঁদছিস—আমার দুঃখে তুই কাঁদছিস? ওরে, এর পরে নির্যাতন আরও বাড়বে। হয়তো তোকেও—না-না, তোর গায়ে আমি

কাটার আঁচড় লাগতে দেব না। তোকে নিয়ে আমি এখান থেকে চলে যাব দূরে—অনেক দূরে।

লতা। কিন্তু কোথায় যাবে মা? কে আমাদের আশ্রয় দেবে?

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। আমি থাকতে তোমাদের আশ্রয়ের অভাব হবে না মামণি।

বিশাখা। বিশু! তুই—

বিশু। আর কিসের মায়ায় এখানে পড়ে থাকবেন গিন্নিমা' জীবনে তো শুধু দুঃখই পেলেন, সুখ আপনার পানে ফিরে তাকাল না। সুখ ব্যাটা বড্ড অহঙ্কারী, মানুষকে ধরা দিতে চায় না।

লতা। বিশুকা! সত্যিই তুমি আমাদের তোমার দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে?

বিশু। হ্যাঁ মামণি। খোকাবাবু দিনের পর দিন যেভাবে অত্যাচার শুরু করেছে, তাতে এখানে থাকলে তোমরা তো শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তোমাদের শেষ হতে দেব না।

বিশাখা। বিশু!

বিশু। যাবেন না গিন্নিমা, আমার সঙ্গে আপনি যাবেন না? এক ছেলে আপনার অসম্মান করেছে বলে আর এক ছেলেকে আপনি অভিমানে দূরে সরিয়ে দেবেন? এই দুঃখী ছেলে আপনার অসম্মান করবে না গিন্নিমা। এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি মাঠে কাজ করব। আর তাতে আমাদের তিনটে পেট কোনরকমে চলে যাবে। তবু সেখানে আমরা শান্তিতে থাকব।

বিশাখা। যাব বিশু, যাব, তোর দেশের বাড়িতেই গিয়ে আমরা আশ্রয় নেব।

লতা। তবে চলো মা, আজই—এক্ষুনি আমরা এবাড়ি ছেড়ে চলে যাই।

বিশু। হ্যাঁ, মামণি ঠিকই বলেছে গিন্নিমা। চলুন—

বিশাখা। একটু দাঁড়া বিশু, যাবার আগে শ্বশুরের পবিত্র ভিটেয় শেষবারের মত একটা প্রণাম জানিয়ে যাই। [গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া] হলো না, এ বাড়িতে আশ্রয় আমার হলো না। আমি বড় মন্দভাগিনী, তাই আজ আমায় সব অধিকার ছেড়ে ভিখারিণীর মত চলে যেতে হচ্ছে। [কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল]

লতা। এসো মা। [বিশাখাকে ধরিল] চলো বিশুকা।

বিশু। [গামছার খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিয়া] হ্যাঁ, এসো মামণি। আসুন গিন্নিমা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

গীতকণ্ঠে অভয়ের প্রবেশ।

অভয়।— **গীত**

ও দয়াল—দয়াল হরি বলে তোমায় সর্বজনা ডাকে,
[তোমার] কেউ নয় আপন, কেউ নয় পর,
তবু তোমার দয়া কেন ভাগাভাগি থাকে।
মনে প্রাণে যে তোমাকে,
আপন বলে ডেকে থাকে,
ভাসতে হয় গো চোখের জলে ব্যথার সমুদ্রে তাকে।

[প্রস্থান।

পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। ব্যথার সমুদ্রে পড়ে আজ আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত দিশেহারা, কিন্তু এ তো আমি চাইনি! তবে কেন আমার চাওয়ার ঘরে হঠাৎ আগুন জ্বলে—সব স্বপ্নকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দিলে?

জীর্ণ মলিন পোশাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। শেখর—শেখর! তুই এখানে আছিস, আর আমি ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। জানি, তুই কোনদিন আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারবি না।

পলাশ। কেমন আছেন কাকাবাবু? [প্রণাম করিল]

সতীনাথ। ও—পলাশ! তুমি? আমি ভাবলাম বোধহয় শেখর।

পলাশ। শেখর আর কোনদিন আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না কাকাবাবু।

সতীনাথ। জানি, তবু আমার মনটাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না। কিন্তু কেন আমার এমন হলো? কেন আমার আশার বুকে কান্নার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল?

পলাশ। এর জবাব আজ আমিও দিতে পারব না। আশাহত পাখি আমি, বেদনার বালুচরে মুখ থুবড়ে পড়ে গুমরে গুমরে কেঁদে মরছি। জানি না আমার এ কান্নার শেষ হবে কি না।

সতীনাথ। একি, তোমার চোখে জল! বলো বাবা কি হয়েছে? অনেক দিন তুমি আমাদের বাড়িতে যাওনি। সেদিন গীতাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে সেও কোন উত্তর দিল না।

পলাশ। কি উত্তর দেবে কাকাবাবু, গীতা আর গীতা নেই। এখন সে হোটেল-নর্তকী।

সতীনাথ। কি বললে! অ-আমার গীতা—

পলাশ। শুধু তাই নয়, সে চরিত্রহীনা।

সতীনাথ। [সচিৎকারে] না—না, এ আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না।

পলাশ। নিজের চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না কাকাবাবু। লোভের হাতছানিতে মানুষ যে কতখানি নিচে নামতে পারে, গীতাই তার জলন্ত প্রমাণ।

সতীনাথ। পলাশ!

পলাশ। আমার ভালবাসার স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে আজ সে শান্তির রাজ্যে বিচরণ করছে। কিন্তু সে সুখ তার চিরস্থায়ী হবে না। আমার দুঃখের ঢেউ তার সুখের রাজ্যে গিয়ে একদিন আছড়ে পড়বেই। আর

সেদিন সে সব পেয়েও সব হারানোর ব্যর্থতায় নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার জানাবে, জানাতেই হবে।

[প্রস্থান।

সতীনাথ। ওঃ, গীতা—গীতা চরিত্রহীনা? ঈশ্বর! একথা শোনার আগে কেন তুমি আমার মৃত্যু দিলে না ঠাকুর, কেন মৃত্যু দিলে না!

গীতার প্রবেশ।

গীতা। বাবা! তুমি কি বল তো! আমি একটু চোখের আড়াল হলে অমনি তুমি অসুস্থ শরীরে রাস্তায় বেরিয়ে আসছো? চলো—ঘরে চলো।

সতীনাথ। হ্যাঁ, যাব। কিন্তু খবরদার, তুই আমার ঘরে যাবি না।

গীতা। কি বলছ তুমি!

সতীনাথ। কি বলছি বুঝতে পারছিস না? ভেবেছিস আমি কিছু জানি না, না?

গীতা। কি জানো—তুমি কি জানো বাবা?

সতীনাথ। আমার কাছে তুই সাধু সাজতে পারবি না। তোর কুৎসিত চরিত্রের পরিচয় আমি পেয়েছি।

গীতা। [আর্তস্বরে] বাবা!

সতীনাথ। ছিঃ-ছিঃ, আমার মুখে তুই কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিলি!

গীতা। বাবা!

সতীনাথ। চুপ! একটা চরিত্রহীনার মুখ থেকে আমি বাবা-ডাক শুনতে চাই না। তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার বাড়ির দরজা তোর কাছে চিরদিনের মত বন্ধ। আজ থেকে আমি

জানব, গীতা বলে আমার যে মেয়ে ছিল, সে মরে গেছে। এই পৃথিবীতে আমি একা—শুধু একা—শুধু একা।

[প্রস্থান।

গীতা। বাবাও আমায় ভুল বুঝলে! আমার চোখের সামনে যেটুকু আলো ছিল, অন্ধকার এসে সেটুকুও গ্রাস করে নিলে? ভালই হলো। আর আমার কোন বাঁধন রইল না। আ-আমি মুক্ত—একেবারে মুক্ত।

[প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

ভাঙা বাড়ির অভ্যন্তর

চিন্তান্বিত ঝন্টুর প্রবেশ।

ঝন্টু। অমাবস্যার নিকষ কালো অন্ধকারের মত ঢেকে আসছে আমার ভবিষ্যতের দিনগুলো। এ আমি কি করলাম! আমি তো আর পাঁচজনের মত ভাল হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু লোভ আমায় কোথায় টেনে নামালো! যেখানে যাই, সেখানেই শুধু দেখতে পাই এক বীভৎস—না-না, আমি আর পারছি না—পারছি না!

নিশীথের প্রবেশ।

নিশীথ। কি রে, এই ভর সন্ধ্যেবেলা এই ভাঙা বাড়িতে কি করছিস? আমি যে তোকে একটা কথা বলার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছি!

ঝন্টু। আমি একটু শান্তি পেতে চাই নিশীথ, শান্তি—শুধু শান্তি।

নিশীথ। ঝণ্টু!

ঝণ্টু। জানিস নিশীথ! আমি ঠিক করেছি, পুলিশের কাছে ধরা দেব।

নিশীথ। সেকি! তাহলে আমাদের ভবিষ্যত কি হবে ভেবে দেখেছিস?

ঝণ্টু। ভবিষ্যত খুব ভাল হবে। সব সময় একটা ভয়, সেই ভয়ের তাড়না থেকে বেঁচে যাব। জানিস, কারা যেন আমার দিকে সব সময় অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা যেন দাঁত বার করে হাসছে আর বলছে—

নিশীথ। চুপ কর্—ওরে চুপ কর্। আমারও ঠিক তোর মত অবস্থা। কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার ঘরে যেন কারা পায়চারি করছে—আর বলছে, নিশীথ, যাদের মুখে হাসি ফোটাতে তুমি পাপের পঙ্কিলতায় ডুব দিয়েছ, তারা কি তোমার পাপের অংশীদার হবে? যার কথায় তুমি একটা ফুলের মত পবিত্র মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে নদার জলে ভাসিয়ে দিয়েছ, সে কি হবে পাপের অংশীদার? আর এই কথাটা বলার জন্য তোকে আমি সারাদিন খুঁজছি।

ঝণ্টু। নিশীথ!

নিশীথ। কিন্তু না, পুলিশের কাছে ধরা আমি দেব না। কারণ পুলিশে ধরা দিয়ে হাজতবাস করার চেয়ে অসৎপথ ত্যাগ করে অন্য কোথাও গিয়ে কুলিগিরি করব।

ঝণ্টু। তুই যা ভাল বুঝিস করিস। তবে হ্যাঁ, পুলিশের কাছে আমি তোর নাম প্রকাশ করব না—তুই অন্তত এইটুকু বিশ্বাস রাখিস। আমরা দু'বন্ধু এতদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি—

নিশীথ। ঝণ্টু!

ঝণ্টু। বিদায় বন্ধু! যদি কোনদিন ফিরে আসি, আবার দেখা হবে। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া] আঃ—

নিশীথ। কি হলো?

ঝণ্টু। আর আমায় পুলিশের কাছে ধরা দিতে যেতে হলো না, আমাকে পায়ে কালে দংশন করেছে।

নিশীথ। কাল! মানে সাপে দংশন করলো?

ঝণ্টু। আঃ—আঃ, ভালই হলো, পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনই হয়ে গেল। শুধু দুঃখ রইল, আমার বাড়ির কাউকে আমি দেখতে পেলাম না। করুণাময় ভগবান! কে বলে তোমার করুণা নেই? আছে ঠাকুর, তুমি যে করুণার অবতার। তো-মা-র ক-রু-ণা-র দ্বা-রে আ-মি প্র-ণা-ম জা-না-ই।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

নিশীথ। চলে গেল। আমার সব সময়ের বন্ধু আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আজ আমি একা—বড় একা। এখন আমি কি করব, কোথায় যাব? হ্যাঁ-হ্যাঁ, পুলিশের কাছে আমি ধরা দেব। রত্নাকর নির্জনে বসে রামনাম জপ করতে করতে বাল্মিকী হয়েছিল, আর আমি বাল্মিকী না হলেও, জেলাখানার নিভৃত কক্ষে বসে করুণাময় জগদীশ্বরকে ডেকে বলব—ঠাকুর, আমার বন্ধুকে যেভাবে তুমি মুক্তি দিলে, হয় সেভাবে আমাকে মুক্তি দাও, নইলে এইটুকু করুণা করো—যেন পরজন্মে আমাকে কোন পাপকাজের সঙ্গী হতে না হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজবল্লভীর মন্দির-প্রাঙ্গণ

প্রসাদের রেকাবী হাতে লতার প্রবেশ।

লতা। রাজবল্লভী মা! নিত্য কত মানুষ এখানে পূজো দিতে আসে। কেউ আসে স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায়, আবার কেউ বা—

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। পূজো হয়ে গেছে মামণি?

লতা। হ্যাঁ বিশুকা। এই নাও প্রসাদ।

বিশু। [প্রসাদ লইয়া খাইয়া] জান মামণি! আমাদের গাঁয়ের এই রাজবল্লভী মা খুব জাগ্রত দেবী। কত দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী এখানে পূজো দিতে আসে।

লতা। হ্যাঁ তাই তো দেখছি। মন্দিরটা কতদিন আগেকার বিশুকা?

বিশু। তা কি আর আমি জানি! সেই ছোটবেলা থেকেই এই মন্দির দেখে আসছি। বাবার মুখে শুনেছিলাম, কোন এক জমিদার নাকি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মায়ের নামে কিছু বিষয়-সম্পত্তিও আছে। তার আয় থেকেই চলে যায়। আর মন্দিরে যে পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, উনি খুব ভালো মানুষ।

লতা। মা তো মন্দির থেকে এখনো এলো না বিশুকা!

বিশু। আচ্ছা আমি দেখছি। তুমি এখানে দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

লতা। কেন জানি না—এই মন্দিরে এলে ঘরে ফিরে যেতে আমার মন চায় না। বারবার শুধু ঘুরে-ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। কি রে বেটি! তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস, বাড়ি যাবি না?

লতা। মা এখনও মন্দির থেকে আসেনি।

ভৈরব। তার জন্য অপেক্ষা করছিস? হ্যাঁ রে, আজ ক'দিনই দেখছি তুই মন্দিরে পূজো দিতে আসছিস। তোর মনের উদ্দেশ্যটা কি বলবি?

লতা। আ-আমি—

ভৈরব। আমার কাছে কোন সঙ্কোচ করিসনে।

মুখভর্তি দাড়ি, ছেঁড়া ময়লা পোশাকে শেখরের প্রবেশ।

শেখর। দাও—দাও, আমায় প্রসাদ দাও। [হাত পাতিল। লতা প্রসাদ দিতে গিয়া শেখরের মুখের দিকে হতভম্ব হইয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল] কি হলো, দাও প্রসাদ।

লতা। [সম্বিত ফিরিল] এই নাও। [প্রসাদ দিল, শেখর খাইতে লাগিল]

ভৈরব। এই আমার এক পাগল ছেলে।

শেখর। আমাকে আর একটু প্রসাদ দাও, আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। [সমস্ত প্রসাদ শেখরের হাতে দিল] এত! [চোখে-মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল]

লতা। খাও।

শেখর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, খাব—আমি খাব। জান, অন্য কেউ হলে এত প্রসাদ আমাকে কিছুতেই দিত না। সত্যি তুমি খুব ভালো—খু-ব ভালো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[পাগলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

ভৈরব। জানিস বেটি! এই পাগল আমাকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না—জানে না।

লতা। উনি কে?

ভৈরব। জানি না। জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে নদীর চড়ায় ওকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে সেখান থেকে তুলে এনে তারা এখানে রেখে যায়। আমি মায়ের চরণামৃত মুখে দিতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে। পরিচয় জানতে চাইলে কোন উত্তরই দিতে পারল না। শুধু আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সেই থেকে আজও ওর সঠিক পরিচয় জানতে পারিনি।

লতা। আচ্ছা, ওর বুকে কি কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল?

ভৈরব। হ্যাঁ। মনে হয় কেউ ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে প্রাণে বেঁচে গেছে। আমি যাই বেটি, নইলে আমার পাগল ছেলে হয়তো কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকবে। ওকে সব সময় আমায় চোখে চোখে রাখতে হয়। [প্রস্থান।

লতা। নদীর চড়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল? এ যে সেই চোখ—সেই মুখ—সেই কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ নিশ্চয় শেখর, ওকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। আমার অপেক্ষায় তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস মা?

লতা। জান মা! শেখরদা মরেনি, সে বেঁচে আছে।

বিশাখা। কি বলছিস তুই! শেখর বেঁচে আছে?

লতা। হ্যাঁ মা, এইমাত্র শেখরদা এখানে এসেছিল। আমি নিজের হাতে তাকে প্রসাদ দিয়েছি।

বিশাখা। এ কেমন করে সম্ভব!

লতা। এসো মা, আমি তোমায় দেখাব। শেখরদাকে ভালো করে দেখলে তুমি ঠিক চিনতে পারবে। এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

তারিণীর বাড়ি

বইয়ের পাতায় চোখ রাখিয়া তারিণীর প্রবেশ।

তারিণী। ওঃ, যত পড়ছি ততই আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কলির ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী এত সুন্দর—এত মধুর! এসব পড়ে আমার মনে কেমন যেন একটা ভাবের উদয় হচ্ছে। আমি যেন ক্রমেই নিজেকে হারিয়ে ফেলছি। হতভাগ্য আমি তাই এতদিন এই অমৃত সাগরে ডুব না দিয়ে শুধু টাকার পেছনেই ছুটে বেড়িয়েছি। কিন্তু কি পেয়েছি আমি? না, কিছুই পাইনি। জীবনভোর শুধু পাপই করে গেলাম। না, আর নয়, এবার আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

নির্মলের প্রবেশ।

নির্মল। হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্তই তোমাকে করতে হবে বাবা।

তারিণী। নির্মল! সত্যিই আমি ভুল করেছি বাবা।

নির্মল। ভুল যে কতখানি করেছ, তা তুমি একবার নিজের চোখে দেখবে চলো।

তারিণী। নির্মল!

নির্মল। হরিকাকা তার মেয়ের বিয়ের সময় তোমাকে বাস্তুভিটে বন্ধক দিয়েছিল, সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে তুমি তাদের বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছ। হরিকাকার স্ত্রী তোমার পায়ে ধরে কেঁদে কিছুদিন সময় চেয়েছিল। কিন্তু তোমার লোভী মন সেকথা কানে নেয়নি। এমনকি তাদের একমাত্র ছেলে কানু তিনদিন অভুক্ত থাকার পর দু'খানা পোড়া রুটি পেয়ে পরম আনন্দে খাচ্ছিল, তুমি তাকে সেটাও খাবার সময় দাওনি। তারপর ক্ষুধায় শুকিয়ে সেই দুধের শিশু মরণের পথে পা বাড়ালে।

তারিণী। তাদের আমি ফিরিয়ে আনব নির্মল। বাড়িটাও ফিরিয়ে দেব।

নির্মল। বোধহয় তার প্রয়োজন হবে না, তাদের একমাত্র নয়নের মণি কানুকে হারিয়ে তারা আর তোমার দয়ার দান হাত পেতে গ্রহণ করবে না।

তারিণী। [আর্তকণ্ঠে] নির্মল।

নির্মল। চলো—তোমার সেই নিষ্ঠুরতার প্রতিচ্ছবি তুমি নিজের চোখে দেখবে চলো। দেখবে কেমন করে মা তার মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে দু'চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। আর বাবা উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে বিড়বিড় করছে। দেখবে না এ স্বর্গীয় দৃশ্য?

তারিণী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, দেখব বইকি, আমি নিশ্চয়ই দেখব। এই সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্যই তো আমি—কে? কে ওখানে জলভরা চোখে

দাঁড়িয়ে? ওই—ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে ও কার মুখ ভেসে উঠছে? কানু? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই তো কানু আমাকে বলছে, বলুন—বলুন আমি আপনার কি অন্যায় করেছি? কেন আপনি আমাকে রুটি খেতে দিলেন না? ওই দেখুন আমার রুটি কুকুরে খাচ্ছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি আমিই তোকে খুন করেছি—খুন করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—হাঃ-হাঃ-হাঃ! [পাগলের ন্যায় হাসিতে লাগিল]

নির্মল। বাবা!

তারিণী। তোর সামনে একজন মহাপাপী খুনী দাঁড়িয়ে আছে, তাকে তুই শাস্তি দে নির্মল, শাস্তি দে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নির্মল। বাবা!

তারিণী। আয়—আমার সঙ্গে তুই আয়। আমার সিন্দুকের সব টাকা আমি তোর হাতে তুলে দেব, তুই সব বিলিয়ে দিবি। আমার কাছে আর আমি কিছুই রাখব না। ওই টাকাই আমাকে খুনী সাজিয়েছে। আমি খুনী—আমি খুনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

নির্মল। বাবার এই পরিবর্তন দেখে আজ আমার আনন্দে প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছে করছে। কতদিন আমি হাসিনি, বাবার পৈশাচিক কীর্তি-কলাপে আমার বুকে যে দুঃখ বাসা বেঁধেছিল, আজ সেই দুঃখের মেঘ সঞ্চারিত হয়ে শুষ্ক মরুভূমিতে এনেছে বৃষ্টি। তাতে তৃপ্ত আমি, আমি জয়ী—আমি জয়ী।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ডাক্তারখানা

আলোকের প্রবেশ।

আলোক। ওঃ, অনেক দেরী হয়ে গেল। [উদ্দেশ্যে] তাড়াতাড়ি করো নবীনকা, আমাকে এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে।

সুটকেশ হাতে নবীনের প্রবেশ।

নবীন। এই যে সুটকেশ এনেছি। [জলভরা চোখে আলোকের সামনে ধরিল]

আলোক। [সুটকেশ হাতে লইয়া] সব ঠিক আছে তো?

নবীন। হাঁ। [গামছার খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিল]

আলোক। এই দেখ, আবার তুমি কাঁদছো নবীনকা? আচ্ছা, আমি তো কদিন পরেই এখানে চলে আসব, না কি?

নবীন। কিন্তু আমি কেমন করে থাকব? তোমাকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে আমি যে কিছুতেই থাকতে পারব না। আমাকে তোমার সঙ্গে নিলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

আলোক। সেখানে তুমি থাকতে পারবে না নবীনকা।

নবীন। তুমি পারলে আমি কেন পারব না?

আলোক। আমি ডাক্তার, যে-কোন পরিবেশেই আমাকে মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আর অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না।

নবীন। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] থাক, আর তোমাকে বোঝাতে হবে না। আমি সব জানি—সব বুঝি।

আলোক। দাও—এবার তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও। [প্রণাম করিল]

নবীন। ভালভাবে থেকো, সময়মত চান-খাওয়া করো। আর নইলে পার তো সব সময়ই শুধু রুগীর চিকিৎসা করে যেও।

আলোক। সেইজন্যই তো আমি মায়াপুরে যাচ্ছি নবীনকা। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে কোন বড় ডাক্তার গিয়ে থাকতে চায় না, অথচ কলেরার প্রাদুর্ভাবে গ্রামখানা আজ উজাড় হতে চলছে। না-না, আর দেরী নয়, আমি আসি নবীনকা!

নবীন। খোকা!

আলোক। জানি না—আমি মায়াপুরে শান্তির বারি সিঞ্চন করতে পারব কিনা। তবে আমি জীবন দিয়েও চেষ্টা করব। আর যদি পারি, সেইটাই হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

[প্রস্থান।

নবীন। পারবে—নিশ্চয়ই পারবে তুমি, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তোমার পরাজয় হবে না। তোমার কর্মই তোমাকে মহৎ করে তুলবে। ঠাকুর! আমি তোমার কাছে নিজের জন্য কিছুই চাই না। তুমি শুধু আমার খোকার মঙ্গল করো ঠাকুর—মঙ্গল করো।

[প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

রাজবল্লভীর মন্দির-প্রাঙ্গণ

শেখরের প্রবেশ।

শেখর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পুজো হয়ে গেছে। এবার সেই মেয়েটা এসে আমায় প্রসাদ দেবে, আমি খাব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [দূরে দেখিয়া] কই, এখনও সে আসছে না তো! আমি ততক্ষণ এখানটায় বসি। [একপাশে বসিল] নিশ্চয়ই সে আমার কাছে আসবে।

প্রসাদের রেকাবী হাতে লতার প্রবেশ।

লতা। [প্রসাদ হাতে লইয়া শেখরকে] এই নাও।

শেখর। দাও। তুমি খুব ভালো। রোজ রোজ আমাকে কত প্রসাদ খেতে দাও।

লতা। আমি ভালো?

শেখর। হ্যাঁ গো। আমি মিথ্যে বলছি না, সত্যিই তুমি খু-ব ভালো। জান, এই রাজবল্লভী মন্দিরের ঠাকুর মশাই আমাকে খুব ভালবাসে।

লতা। শুধু ঠাকুর মশাই ভালবাসে? আর কেউ বুঝি তোমাকে ভালবাসে না?

শেখর। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আর একজন আমাকে খুব ভালবাসে, সে হচ্ছো তুমি।

লতা। [আবেগে] আ-আমি তোমায় ভালবাসি!

শেখর। হ্যাঁ গো। আমি জানি, তুমি আমায় সত্যিই খু-উ-ব ভালবাসো।

লতা। এই দেখ, কথায় কথায় আমি একেবারে ভুলে গেছি। মায়ের পায়ের ফুলটা তোমার কপালে এখনও ছোঁয়ানো হয়নি। [ফুল লইয়া শেখরের কপালে ঠেকাইল]

শেখর। জান, আর একজন—আর একজনও ঠিক এই রকম ভাবে আমাকে—

লতা। চুপ করে গেলে কেন! বল, আর কে তোমাকে ভালো-বাসে?

শেখর। না-না, আমি আর কিছু মনে করতে পারছি না, আমি কিছুই বলতে পারব না।

লতা। না, বলতে তোমাকে হবেই। [শেখরকে ধরিয়া] আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি বলো, আমি—

শেখর। [চিৎকার করিয়া] ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কিছু জানি না—কিছু বলতে পারব না। [ছুটিয়া চলিয়া যাইতে গিয়া পড়িয়া গেল ও আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

লতা। একি, পড়ে গেলে তুমি! [ধরিয়া তুলিল, শেখর দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে লতার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল] কি দেখছ তুমি অমন করে!

শেখর। তুমি—তুমি—

লতা। লতা—আমি তোমার লতা। আর তুমি আমার একমাত্র অবলম্বন।

শেখর। লতা! কিন্তু—কিন্তু আমরা এই মন্দিরে কেমন করে এলাম?

লতা। সে অনেক কথা। মায়ের আশীর্বাদে তুমি যখন আমাকে চিনতে পেরেছ, তখন আমি তোমাকে সব কথা খুলে বলব।

শেখর। আমারও সব কথা এখন মনে পড়ছে। নদীর ধারে আমরা দুজনে বেড়াতে এসেছিলাম, তারপর কোথা থেকে দুজন লোক এসে আমার বুকে ছুরি বসালে।

লতা। হ্যাঁ, তারা তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু মায়ের আশীর্বাদে তুমি প্রাণে বেঁচে গেছ।

শেখর। আমি এখুনি বাড়ি যাব লতা। বাবা আর গীতা কেমন আছে এখুনি দেখতে যেতে হবে।

ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। যাবে বইকি বাবা, নিশ্চয়ই যাবে। তবে তার আগে ওই মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করো।

শেখর ও লতা। আপনি!

ভৈরব। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তোদের সব কথাই শুনেছি। সন্দেহ আমার সেদিনই হয়েছিল, যেদিন শেখরকে প্রথম দেখার পর তুই আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করেছিলি। শুধু তাই নয়, তোর মনের মধ্যে যে একটা ঝড উঠেছিল, আমি তাও টের পেয়েছিলাম।

লতা। আমি—

ভৈরব। ওরে বেটি! মায়ের কৃপায় আর তোর অসাধ্য সাধনায় শেখর আজ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, ফিরে পেয়েছে ওর পুরোনো স্মৃতি। শেখর! আমার ইচ্ছে, তুমি আজই—এখুনি মায়ের মন্দিরে দাঁড়িয়ে লতার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে ওকে তোমার স্ত্রীর মর্যাদা দাও।

শেখর। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে ঠাকুর মশাই। [শেখর ও লতা ভৈরবের পদধূলি মাথায় লইল]

বিশাখা ও বিশুর প্রবেশ।

বিশাখা। লতা—লতা—

ভৈরব। তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ মা। চলো, মন্দিরে চলো। শেখর আর লতা মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আজ থেকে নতুন জীবনের পথ চলতে শুরু করবে, আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখব ওদের দাম্পত্য সুখী জীবন।

শেখর। জ্যাঠাইমা! [বিশাখাকে প্রণাম করিল]

বিশাখা। শেখর! তুমি—

বিশু। তুমি আমাদের চিনতে পারছো দাদাবাবু?

শেখর। হ্যাঁ বিশুদা, আমি তোমাদের সবাইকে চিনতে পারছি।

বিশাখা। [হাতজোড় করিয়া উদ্দেশ্যে] মা গো রাজবল্লভী! সত্যিই তুই দয়াময়ী মা।

ভৈরব। এসো শেখর।

শেখর। চলুন। লতাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে আমি ছুটে যাব পলাশপুরে আমার বাবা ও বোনের কাছে। কতদিন তাদের আমি দেখিনি। একবার দেখার জন্য মনটা ছটফট করছে।

বিশাখা। যাবে বাবা, সেখানে তুমি নিশ্চয়ই যাবে, আর লতাও তোমার সঙ্গে যাবে। তোমার হাত ধরে শ্বশুরের পবিত্র ভিটেয় গিয়েই ওকে প্রথমে উঠতে হবে। আজ আমি ভারমুক্ত, আর আমাকে ওই হতভাগিনীর জন্য কোন চিন্তা করতে হবে না, আমার সকল চিন্তার অবসান।

লতা। আমাদের সঙ্গে তুমি পলাশপুরে যাবে না মা?

বিশাখা। না, সেখানে আমি আর কোনদিনই যাব না। আমার জীবনের বাকি দিনগুলো আমি এই মায়ের মন্দিরেই কাটিয়ে দেব। আর বিশু তো রইল, আমার ছেলের কর্তব্য ওই তো করছে।

বিশু। গিন্নিমার জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না মামণি। তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মন দিয়ে সংসারধর্ম করবে, আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমার খোঁজখবর নিয়ে আসব।

ভৈরব। এসো, অযথা আর দেরী করো না।

বিশাখা। চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

বীরেনের বাড়ি

সন্তর্পণে বীরেনের প্রবেশ।

বীরেন। না, এখান থেকে কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিতেই হবে। মিষ্টার পাকড়াশী যে ধরা পড়ে দলের সমস্ত গোপন খবর পুলিশের কাছে বলে দেবে, এ আমি ভাবতেও পারিনি। এখন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার কোন পথ নেই। না-না, পুলিশের হাতে ধরা আমি কিছুতেই দেব না।

উদ্যত পিস্তল হস্তে দীপঙ্করের প্রবেশ।

দীপঙ্কর। ব্যাডলাক্, ধরা আপনাকেই দিতেই হচ্ছে বীরেনবাবু।

বীরেন। আপনি—

দীপঙ্কর। কেন এসেছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন! আশা করি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাবার কোন প্রয়োজন হবে না।

বীরেন। আ-আমি—

দীপঙ্কর। ছিঃ-ছিঃ, আপনি একজন ভদ্রসন্তান হয়ে নারী-পাচার চক্রের সঙ্গে যে কিভাবে জড়িত ছিলেন, এটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

বীরেন। না, মানে—

দীপঙ্কর। ভারতের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে ভোগের চেয়ে ত্যাগের মন্ত্র বড়। আর আপনি কিনা ত্যাগের পথ রুদ্ধ করে শুধু ভোগের পথকেই বেছে নিলেন? আপনি জানেন না, কতবড় অপরাধ করেছেন? আর এই অপরাধের জন্য আপনার কি শাস্তি অপেক্ষা করছে জানেন?

বীরেন। আ-আমি আপনাকে অনেক টাকা—

দীপঙ্কর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেছেন বীরেনবাবু। অর্থ দিয়ে যাদের বশীভূত করা যায়, তাদের দলের আমি নই। আপনার অপরাধের যোগ্য শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। [হাতকড়া পরাইল] চলুন, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বীরেন। একটা কথা—

দীপঙ্কর। না, আর কোন কথা নয়। চলুন।

[অগ্রে বীরেন, পশ্চাতে পিস্তল হস্তে দীপঙ্করের প্রস্থান।

দৃশ্যান্তর

নদীর তীর-সংলগ্ন পথ

ঝড়ের বেগে পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। গীতা—গীতা! নাঃ—এখানে নেই, বাড়িতেও নেই। তবে গেল কোথায়? যেখানেই থাকুক, তাকে আমি খুঁজে বার করবোই। তার কাছে আমায় ক্ষমা চাইতে হবে: আমি যে ভুল বুঝে তাকে আঘাত দিয়েছি। ওঃ, আমি যদি আগে বুঝতে পারতাম মিষ্টার দেশাইয়ের সঙ্গে ওর ভাই-বোনের সম্পর্ক! এর জন্য আমি দায়ী। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই দায়ী। গীতার মুখ থেকে আমি সব কথা শুনতে চাইনি, শুধু তাকে আঘাতই দিয়েছি। আজ যদি মিষ্টার দেশাই আমাকে সব কথা খুলে না বলতেন, একটা ভুল ধারণা আমার মনে বাসা বেঁধে থাকত। আমার এখন কর্তব্য গীতাকে খুঁজে বার করা। গীতা—গীতা—

টলিতে টলিতে গীতার প্রবেশ।

গীতা। কে—কে আমার নাম ধরে ডাকছে? মনে হচ্ছে কত চেনা কণ্ঠস্বর। কিন্তু না, সে তো আমায় কোনদিনই ডাকবে না। সে যে আমাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তবে কি আমি বাতাসে শুনতে পাচ্ছি তার কণ্ঠস্বর?

পলাশ। না। আমি তোমায় খুঁজছি গীতা!

গীতা। পলাশদা! তুমি—[একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল]

পলাশ। হ্যাঁ, আমি। চলো—ঘরে ফিরে চলো গীতা।

গীতা। ঘর! ঘর তো আমার নেই।

পলাশ। আছে, তোমার স্বপ্নের ঘরেই তুমি যাবে।

গীতা। স্বপ্নের ঘর আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমি যে দেহবিলাসিনী। একটা দেহবিলাসিনীকে কেউ কোনদিন আশ্রয় দেয় না। সকলের কাছে পায় শুধু সে ঘৃণার থুৎকার।

পলাশ। না, তুমি দেহবিলাসিনী নয়। মিষ্টার দেশাই আমাকে সব বলেছেন। আমার ভুল ভেঙে গেছে গীতা।

গীতা। বড় দেরী হয়ে গেল পলাশদা। আর একটু আগে যদি—

পলাশ। কি হয়েছে গীতা? তুমি এভাবে টলছো কেন?

গীতা। [জড়িত কণ্ঠে] মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য আমি বিষ খেয়েছি।

পলাশ। [চিৎকার করিয়া] না। এ ভুল তুমি কেন করলে গীতা, এ ভুল কেন করলে?

গীতা। চারপাশের আশার আলো যখন দমকা ঝড়ে নিভে যায়, হতাশার অন্ধকারে ভরে যায় চারিদিক, তখন মানুষ মৃত্যুর পথকেই বেছে নেয়। আমিও তাই নিয়েছি। তবু আমার সান্ত্বনা—মৃত্যুর সময়ে তোমার মুখটা আমি দেখতে পেলাম। জান, কদিন ধরেই তোমার মুখটা একবার দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করছিল, কিন্তু তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস আমার ছিল না। তাই আমার ইচ্ছেই বোধহয় তোমাকে আমার কাছে টেনে এনেছে। আজ আমার কি শান্তি! দাও—তোমার পায়ের ধূলো একটু দাও। [অতিকষ্টে পায়ের ধূলা লইল]

পলাশ। গীতা!

গীতা। দুঃখ করো না গো, আমার জন্য চোখের জল ফেলো

না। আমি তোমার কিছুই করতে পারিনি। সারাজীবন শুধু তোমাকে দুঃখই দিয়ে গেলাম, পারলাম না একটু শান্তি দিতে। পার তো— পা-র তো তু-মি আ-মা-কে ক্ষমা—ক-রো! [পড়িয়া গেল ও মৃত্যু]

পলাশ। [মৃতদেহের পাশে বসিয়া চিৎকার করিয়া] গীতা— গীতা! আমাকে এভাবে একা ফেলে তুমি চলে গেলে? আমি না হয় ভুল করেছিলাম, তার জন্য তুমি আমাকে এতবড় শাস্তি দিলে? আমার কথা তুমি একটিবারও ভেবে দেখলে না? দেখলে না— তোমাকে হারিয়ে আমি কি নিয়ে থাকব—কেমন করে বাঁচব? [ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

সতীনাথের প্রবেশ।

সতীনাথ। গীতা—গীতা! ওদিকে সবাই বললে গীতা না কি এদিকেই এসেছে। পলাশ খোঁজ নিয়ে জেনেছে, গীতার চরিত্রে কোন দোষ নেই। থাকবে কি করে? আমার মেয়ে সে ধরনেরই নয়। তবুও আমি উত্তেজনার বশে তাকে—[সহসা দেখিয়া] পলাশ! তুমি এখানে? ওভাবে মাটিতে শুয়ে আছে কে?

পলাশ। গীতা।

সতীনাথ। কেন, কি হয়েছে গীতার?

পলাশ। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সতীনাথ। কি বললে! গীতা আত্মহত্যা করছে?

পলাশ। হ্যাঁ কাকাবাবু! আমি আর একটু আগে এলে হয়তো গীতাকে বাঁচাতে পারতাম।

সতীনাথ। পারতে না। মা যে আমার বড় অভিমানী, তাইতো আমার ওপর অভিমান করে চলে গেল। [ধীরে ধীরে মৃতদেহের

কাছে বসিয়া] হ্যাঁ রে মা, তুই শুধু আমার মুখের কথাটাই বড় করে দেখলি, আমার অন্তরের ব্যথা বুঝতে চাইলি না ? দেখ—দেখ পলাশ, মায়ের চোখের জল এখনও চিকচিক করছে। হতভাগিনী আমার সংসারে এসে সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়েছে, এতটুকু সুখ পায়নি কোনদিন। জীবিতাবস্থায় আমি ওর চোখের জল মুছে দিতে পারিনি, আজ মৃতাবস্থায় ওর চোখের জল মুছিয়ে দিই।

পলাশ। কাকাবাবু! আপনি—

নেপথ্যে শেখর। বাবা—বাবা—

সতীনাথ। কার কণ্ঠস্বর! যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে! তবে কি—[উঠিয়া দাঁড়াইল]

শেখর ও লতার প্রবেশ।

শেখর। বাবা—বাবা—

সতীনাথ। শেখর—শেখর। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো ? সত্যিই তুই আমার শেখর ?

শেখর। হ্যাঁ বাবা, আমি মরিনি, মায়ের আশীর্বাদে প্রাণে বেঁচে আছি। আর এই লতার সেবায় আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি। লতাকে আমি বিয়ে করেছি বাবা।

সতীনাথ। ভালই হয়েছে। কিন্তু—

শেখর। আমি সোজা বাড়িতেই গিয়েছিলাম। দেবেনকা বললে তুমি এদিকেই এসেছ, তাই আমরা এখানে ছুটে এলাম। কতদিন তোমাকে আর গীতাকে দেখিনি। গীতা কোথায় বাবা ?

সতীনাথ। ওই—ওই মা আমার শান্তির বিছানায় ঘুমিয়ে আছে মহাশান্তিতে। [মৃতদেহ দেখাইল]

লতা। গীতা—

সতীনাথ। আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে মা।

শেখর। নেই—গীতা নেই! না-না, এ দৃশ্য দেখব বলে আমি আসিনি। গীতা আমার জন্য অনেক কিছু করেছে, কিন্তু আমি ওর জন্য কিছুই করতে পারিনি—পারিনি দাদার কর্তব্য করতে। ওঃ গীতা—

পলাশ। গীতার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী শেখর।

সতীনাথ। না-না, তোমরা কেউ দায়ী নয়, এ সবই আমার অদৃষ্ট। পোড়া অদৃষ্টের সঙ্গে লড়াই করে বারবার পরাজিত হয়েছি আমি। যখনই সুখের কিনারায় উঠতে গেছি, তখনই দুঃখের ঢেউ এসে আমাকে আছড়ে ফেলেছে বেদনার বালুচরে। এই হতভাগ্য সতীনাথ এ পৃথিবীতে শুধু কাঁদতেই এসেছে। আমার এ কান্নার শেষ কোনদিন হবে না। তাই তো আজ পূর্ণ হয়েও শূন্য হয়ে রইল "সতীনাথের পাঠশালা"।

যবনিকা